ক্রীতদাস ক্রীতদাসী

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স ॥ কলকাতা বারো

রচনাকাল। ১৯৬০
প্রথম প্রকাশ। অগস্ট, ১৯৬১

প্রকাশক : নির্মলেন্দু ভদ্র

এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স
এ/৯, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা-১২
মুদ্রাকর। অমলেন্দু ভদ্র
মুদ্রণ ভারতী
১৬/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা ১২
প্রচ্ছদ ব্লক। ব্লকম্যান প্রসেস
প্রচ্ছদপট মুদ্রণ। নিউ প্রাইমা প্রেস
সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ রূপায়ণ। পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুহৃদপ্রতিমেষু

শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ দত্ত, শ্রদ্ধাস্পদেষু

সমীরণ চট্টোপাধ্যায়
২৬।৯।৬৪

গ্রন্থে সংকলিত গল্পগুলির নায়ক বিজন। বিজন নামে একজন সাম্প্রতিক যুবকের চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন গল্পে উপস্থিত করেছি।

'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী' গল্পের কবিতাটি জীবনানন্দ দাশের। বোরিস পাস্তেরনাকের দুটি পঙ্‌ক্তি 'বিজনের বক্তব্য' গল্পে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. ৩৩ পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তিতে 'আমি খাব।' ছাপা হয়েছে, ওটা ভুল। অনুগ্রহপূর্বক পড়বেন, 'আমি যাব।'—লেখক ॥

বিজনের রক্তমাংস

আজ ভোরবেলা বাথরুমে মুখ ধুতে গিয়ে বমি পেতেই বাধা না দিয়ে বিজন বমি করল। তার মুখ দিয়ে রক্ত উঠল। আরো বমি পায় কিনা দেখে, ভাল করে গার্গল করে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে সে ঘরে এল। শীত পাচ্ছিল, তাই কাঁথা মুড়ি দিয়ে, দেওয়ালে দুটো বালিশ রেখে তাতে ঠেস দিয়ে বসল। তখনো তার কপালে রক্ত লেগে ছিল।

এই ভোরে মেজদা ফ্যাক্টরি যাবে, যাবার আগে দরজাটা ভেজিয়ে দিল, বিজন তার শব্দ পেল। এই সময়টাকে ধরে রাখার চেষ্টায়, বিজন জানে, মেজদা এখন বউদিকে বুকে জড়িয়ে রেখেছে। মেজদা বেরিয়ে গেলে, বউদি হাসিমুখ জানালার গরাদে চেপে, তারপর কাছে এসে বলল, 'এই চা খাবে?' বাইরে বহুদূর পর্যন্ত তখন বৃষ্টি হচ্ছিল, স্নানের পর মেয়েরা যেমন চুলে ঝাপ্টা দেয়, তেমনি করে হাওয়া এসে মাঝে মাঝে ঝাপ্টা মেরে যাচ্ছে। দু'-একটা কাক-পায়রা ওড়াউড়ি করছিল, বৃষ্টি হঠাৎ ঝেঁপে এলে বিজন বউদিকে বলল, 'হ্যাঁ, করো,' তারপর বলল, 'আদা দিও, বুঝলে?' এই যে এমন তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে, পাখিদের এতে খুব একটা আপত্তি আছে বলে তো মনে হয় না। এ দু'-এক মিনিটের ব্যাপার নয় বুঝে অনেকেই চোখ বুজেছে নিশ্চিন্তে। এদিকে, কাছেই, জানালার শার্শিটা ফেটে চুরমার হয়ে যাচ্ছে বারবার। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো একটু

মন্থরভাবে নেমে এসে ফেটে যাচ্ছে হঠাৎ, তারপর চৌচির জলরেখা কী তীব্রতায় ছড়িয়ে যাচ্ছে কাচময়! বিজন মনে করে দেখল, অন্য সব কিছু স্তব্ধ হলে তবে বৃষ্টিপাত হয়। এই সময় যা-কিছু শব্দ শোনা যায়—রেল, মেঘ, কি ট্রাফিকের হর্ন, জলের ছপছপ বা মানুষের স্বর, সবই প্রতিধ্বনির মত মনে হয়।···বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ধোঁয়া উড়ে যাচ্ছে হালকা বেগুনি রঙের।

বিজন বসে বসে আরো ভাবতে লাগল। বিজন সবচেয়ে বেশি ভালবাসত তার আন্তরিকতাকে, সন্দেহও করত তাকেই সব চেয়ে বেশি, আজ আর কোন সন্দেহ নেই, অভিমান নেই, রাগ নেই, আজ সে খুব আন্তরিকভাবে ভাববার চেষ্টা করতে লাগল। বাকি ভাবনাগুলো খুব এলোমেলোভাবে এলেও, দুটো ব্যাপার তার মনে এল প্রথমেই। এক হল এই যে, তার যে খুব গুরুতর অসুখ হয়েছে এটা আর অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই। বিশ্বাস করতে পারছে না অথচ অনস্বীকার্য, এমনি একটা অনুভব বৃষ্টিশেষের অপরাহ্ণের আলোর মত সমুজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল তার বুক জুড়ে। বিজনের মনে হল ঠিক এ রকম আলোতেই মেয়ে দেখাতে হয়, দেখালে, কালো মেয়েকেও সোনালি-ফর্শা দেখায়। দ্বিতীয় কথা তার এই মনে হল যে, সে কোনো মহিলার সঙ্গে প্রেম করে না। এরপর বিজন অন্য কিছু ভাবল না কয়েক মুহূর্ত। এই সময় হাওয়া উঠে এমন ঝাঁপিয়ে দিয়ে গেল বৃষ্টিটা যে, কিছুক্ষণ বারিপতনের আওয়াজও আর শোনা গেল না। বিজন তখন ভাবল, আচ্ছা, ভাল যদি বাসত কেউ, তাহলে আমার এই অবস্থাটা কি অন্যরকম হত? এই যে আজ সকাল থেকে

অনুভবের একটা আলো তার বুক জুড়ে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে ক্রমশ, যার ফলে তার বক্ষদেশ দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট, আলোর সামনে ধরা এক্স-রে প্লেটের মত সমস্ত অন্ধকার বুক এখন ঝল্‌ঝল্‌ করছে—তাহলে, যদি নারীর ভালবাসা থাকত, এ-রকম অবস্থা তার হত কি? বিজন বুঝতে পারল, না, অপ্রেমে আছে বলেই বুক জুড়ে আজ এমন ঝলমলানি, সেখানে তাই এত কোলাহল। বিজনের হঠাৎ মনে পড়ে গেল, এই রকম অসুখ হবার পর ার বন্ধু হিরণ্ময় যখন ছ'মাস অনুপস্থিত রইল আড্ডায়, কই, ত সেনসিটিভ হওয়া সত্ত্বেও, হিরণ্ময় এই ছ'মাস কাল যে খ ভোগ করেছে একা, সেই দুঃখ তার তো একদিনও হয় নি। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে মনে পড়েছে বটে যে, হিরণ্ময় আমাদের মধ্যে নেই, সে বাড়িতে বসে আছে। কিন্তু তাকে যে ইনজেকশন নিতে হচ্ছে—যন্ত্রণাকর, জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে থাকতে হচ্ছে—যন্ত্রণাকর, তার যে মনে পড়ছে, সে যে হিংসে করছে, ওই যে-লোকটা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে বাজার করতে, চাকরি করতে, মোট বইতে—ওরই মত কয়েকটি লোক, তাদের শুধু হাঁটাটুকু জানলার ধারে বসে সে যে নীরবে হিংসে করছে—এইসব দুঃখের কথা তার তো মনে হয় নি! তারপর সেরে উঠে হিরণ্ময় যখন তাদের মধ্যে ফিরে এল, তা আরো দুঃখের, নয় কি? তারা যখন একটার থেকে আর-একটা সিগারেট ধরিয়ে নিত, হিরণ্ময় কি অন্যমনস্ক হয়ে যেত না? বা, সবাই মিলে যখন আড্ডা দিতে হেঁটে যেত ময়দান অবধি, 'যাই, বাড়িতে কাজ আছে,' হিরণ্ময় তো এই কথা বলেই চলে যেত। এটা তো অধিকতর দুঃখের যে, একজন যুবক ছেলে যদেচ্ছ খরচা করতে পারছে না তার শরীর, তাকে সাবধানে থাকতে

হচ্ছে, সন্ধ্যা হলে তাকে ডিম ও দুধ খেতে বাড়ি যেতে হয়। সমস্ত দুঃখ তাকেও একা ভোগ করতে হবে, বিজন এতদিনে বুঝতে পারল; বুঝতে পারছে কিন্তু কান্না পাচ্ছে না, দুঃখ হচ্ছে না, কারণ এই সমস্ত বুঝতে-পারাই বিজনের মনে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে চলে যাচ্ছে। এরা এত সঠিক যে, বিজনের কোনো দুঃখবোধকেই এরা পরোয়া করে না। সমুদ্র নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখেছিল বলে, বিজন জানে, গত ক'মাস ধরেই তার পুরীতে, সমুদ্রের ধারে, কিছুদিন কাটিয়ে আসার ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু এখন যদি বিজন যায়, ছোটাছুটি করতে করতে যায় সমুদ্রের ধার অবধি, যে জ্বলন্ত জামাকাপড় সে পরে আছে সবই রাস্তায় ফেলে দিতে পারবে, কিন্তু সমুদ্রের সামনে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়ালেও বীজাণুগুলির হাত থেকে তবু সে কি পরিত্রাণ পাবে! কিছুতেই, কিছুতেই রেহাই সে পাবে না। কোথায় বিজাণুগুলি কামড়ে পড়ে রয়েছে, সে জানে। কিন্তু সে কি পারে বুকের সেই হাড়টাকে খুলে সমুদ্রের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিতে? সে যদি বলে, আমি কিছুই চাই না, মানুষের পরিবর্তে একটা কেঁচোর জীবন গ্রহণ করতেও আমি খুব রাজি আছি, কারণ আমি যদিই বেঁচে উঠি অর্ধজীবিত হয়ে বেঁচে থাকতে চাই না, এর চেয়ে মেরুদণ্ডহীন হলেও কেঁচোর সম্পূর্ণ জীবন আমার কাম্য—এমন কি সে যদি লিখে দেয় যে, ভবিষ্যতে নারী সম্পর্কেও সমস্ত দাবী সে ছেড়ে দিচ্ছে, তাহলেও কি সেই অনির্বচনীয় হুণ্ডির মালিক তার শরীর থেকে সব ক'টি বীজাণু তুলে নিতে পারে, পারে না!

বিজনের খেয়াল হল, বৃষ্টি থেমে গেছে, শোকের মত ফোঁটা ফোঁটা এখন পড়ছে, ওড়াউড়ি করছে হাওয়ায়।

বিষণ্ণভাবে ঘাড় ফিরিয়ে, লক্ষ্যহীন দৃষ্টি মেলে সে তা দেখল। সহসা তার কবির দু'টি লাইন মনে পড়ল···

The candle on the table burned,
The candle burned

কবিতাটা সে একবারও অনুবাদ করার চেষ্টা করেছিল কি? সে লাইন দুটো বিড়বিড় করতে লাগল।

কোলের ছেলেটা তার মেজ বউদির গলা জড়িয়ে ধরে আছে। চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে, তার হাত গলা থেকে টেনে ছাড়াতে-ছাড়াতে, বউদি, যাকে বলা হয় অর্থপূর্ণ, সেইরকম হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'কী গো, কবিতা?' বিজন বলল, 'আদা দিয়েছ?' ছেলেটা মেঝেয় হামা দিচ্ছিল, এখন আঙুলে একটা জ্যান্ত পিঁপড়ে টিপে তুলে ধরেছে মুখের কাছে, এই মুখে দিল বলে, তাকে বাধা দেবে কি—একদিন বউদির ছেলেটাকে সে কোলে নেবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে, এটা আগে থেকে বুঝতে পেরে কেন সে তাকে যথেষ্ট আদর করে নেয় নি, এই আপসোসে বিজনের চোখে জল এসে গেল, সে মুখ ঘুরিয়ে নিল। বউদি আরো কাছে এসে বলল, 'কী গো···' 'আঃ' বলার মত করে বিজন বলল, 'না'; বলে হাসল। নিজের হাসিটা সে দেখতে পেল।

সমস্ত বুক জুড়ে বিজন এবার একটা ব্যথা অনুভব করল। সেই কোন ভোরে বাথরুমে রক্তপড়ার পর, সে-কথা এই প্রথম আবার তার মনে পড়ল।

বৃষ্টি থামলে বিজন রাস্তায় বেরুল। রোদ উঠছে, শরীরের

কোথাও কোনো অসুবিধে নেই। না-কোনো যন্ত্রণা, না-মাথাধরা, না-কিছু। সকালে অল্প কাশি ছিল, এখন তাও নেই। শুধু চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে বার বার।

কবে থেকে মনে নেই, বহুদিন, বোধ হয় সেই কৈশোর থেকে ; ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই আয়নায় মুখ দেখা বিজনের অভ্যাস। বড়দির কাছে শুনেছে, সাত-আট মাস বয়সে যখন তাকে প্রথম আয়না দেখানো হয়, সে মিনিট-দুই গম্ভীর হয়ে ছিল, তারপর ফিক্ করে হেসে ফেলে। ছেলেবেলা থেকেই বিজন স্বপ্ন দেখত অত্যন্ত বেশি, দীর্ঘ ঘুমে ও স্বপ্ন দেখে-দেখে ক্লান্ত নিজের ফোলাফোলা মুখটা, রাত পোহালে, আয়নায় দেখতে বরাবরই তার ভাল লাগত। বাবার কথা মনে পড়ল বিজনের। বাবা শেষ যে-কদিন বেঁচেছিলেন, প্রায়ই বলতেন, 'কীরে, তোদের আজকালকার ছেলেদের হ'ল কী। আয়নায় কী দেখছিস ? এই ঘুম ভাঙল, এখন মুখ-হাত ধো, বাইরে যা ; সূর্য ওঠে নি, পৃথিবীটাকে দেখার এই তো সময়।'

ছেলেবেলা থেকেই বিজনের সুন্দর ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে। তার পার্শ্ববর্তী বন্ধুটিকে বড়দের কেউ না কেউ প্রায়ই বলে গেছে, 'বাঃ, ছেলেটি বেশ সুন্দর তো!' অথচ কেউ কোনোদিন বলল না তাকে কেমন দেখতে, শুধু চুপচাপ থেকে গেল। সস্তা আয়নাগুলির কথা বাদ দাও, সেগুলির পারা খারাপ, কাচ ভাল নয়। কিন্তু, এ-বিষয়ে, দামি এবং বিলিতি ও ভাল আয়নাগুলিও তাকে কিছু জানাতে পারল কই? কলেজে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হল সুরেশ্বরের ; সুরেশ্বর প্রথমদিনেই ওয়াই. এম. সি. এ-র কেবিনে বসে তার জ্ঞান ও বিশ্বাসমত কেমন মৃদু হেসে জানাল, 'আমার রূপের, বুঝলেন না, ছেলে-

বেলা থেকেই প্রশংসা শুনে আসছি।' ঠোঁটের কোণ দিয়ে সুরেশ্বরের ধোঁয়া-ছাড়া বেশ মনে পড়ে। বিজন হঠাৎ ভাবল, আচ্ছা, রূপসীরা আয়নাকে কত ভালবাসে? বিজনও আয়না ভালবাসত।

আজ সকাল থেকে বিজন আয়না দেখে নি। দেখে নি, কিন্তু বর্ণনা-করা কোনো মুখের মত সে দেখতে পাচ্ছে, তার মুখটা ফোলাফোলা, গাল দুটো চিনচিন করছে, চোখের নিচে দু'-তিনটে বেশি আঁচড়, কোলে কালি। বারবার চোখ দুটো টেনে তুলছে সে ভ্রূ দিয়ে। বিজনের চোখ বরাবরই একটু বেশি কালো, আপনপ্রিয়, ভাসাভাসা। চোখ দু'টি আজ বসে গিয়েছে বলে সে খুবই মনোকষ্ট পেল। সে আট নম্বর বাস ধরল।

'কী বিজু, কী খবর!' বুকটা ধড়াস করে উঠল বিজনের। বেচুর সঙ্গে আজকাল বিজনের প্রায়ই দেখা হয়; কিন্তু সেই কবে স্কুলে সেকশন বদল হবার জন্য কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, পরে দু'-একবছর দূর থেকে যে-কোনো একজনের ভ্রূ-নাচানো অর্থাৎ 'খবর ভাল,' এবং আর একজনের ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি-সূচক হাসি, এই ছিল। ক্রমশ এটা পীড়াদায়ক হয়ে উঠলে, হঠাৎ দেখা হলে কেউ কাউকে আর দেখতে পেত না। তারপর প্রায় ন' বছর পরে, আজ, এই ভোরবেলা, বিজন নয়—বিজু—'কী বিজু,' 'কী খবর?' 'অনেকদিন পরে দেখা হল।' প্রীতিকর হাসি হেসে স্মিতচক্ষে বেচু তাকাল। বিজন মুখের কিছু ঢাকবার চেষ্টা করল না। মুখ শুকনো হয়ে গেছে সন্দেহ নেই, শাদাটে দেখাচ্ছে, দেখাক। 'হ্যাঁ, তা সত্যি।' বলল। গালের যেখানটা চিনচিন করছে, সেখানটা কি কাঁপছে? বিজন সেজন্য কমপ্লেক্স

বোধ করল। হয়ত খুব ফোলাফোলা দেখাচ্ছে, অভিনেতা রুজ মাখলে যেমন হয়, হয়ত তেমনি লাল…'বেশ লাল দেখাচ্ছে তোকে। মোটা হয়েছিস।' মোটা? বিজন অস্বীকার করে হাসল না, স্বীকার করেও না। এমনি হাসল। বাসের হ্যাণ্ডেল ধরে বেচু ছেলেবেলার গল্প শুরু করল। ওরা যখন মর্নিং-স্কুলে যেত বিজন বাড়ি থেকে ডেকে নিত বেচুকে, বিজনের কি মনে পড়ে? মনে পড়ে বিজনের; মনে পড়ে ছোটবেলায় একদিন এই বেচুকে দেখে এমন কি মা পর্যন্ত বিজনের সামনেই বলেছিল, 'আহা, কী সুন্দর দেখতে রে তোর বন্ধু!' কিন্তু কেন বেচু এতদিন পরে তার সঙ্গে কথা বলছে, বলছে যদি এ সব বলল কেন, বিজু বলে ডাকছে কেন—তবে কি, তাহলে, সকালের রক্ত-ওঠার সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে কিছু? বেচুকে তার এত ভাল লাগছেই বা কেন, তার মধ্যে ভালবাসা হচ্ছে কেন, এমন ব্যাকুল! হঠাৎ একটা কথা মনে হল। আরে, মর্নিং-স্কুল তো গ্রীষ্মকালে হয়। অথচ তার এতক্ষণ মনে হচ্ছিল, স্কুল-যাবার সমস্ত পথটা শীতের কুয়াশায় ভর্তি। বস্তুত, শীতের ভোর ও তার কুয়াশাকে সে কিছুতেই আলাদা করতে পারছে না তার মর্নিং-স্কুলের পথ থেকে। আচ্ছা, ভাল কথা, বিজুর কি মনে পড়ে যে মর্নিং-স্কুলের পথে একটা দেবদারু গাছ ছিল, মনে পড়ে…মনে পড়ে…'মনে পড়ে কি বিজন, তোর?'

ড্রাইভারের পিছনে বসা সিট থেকে লম্বা ও বাঁকা নাকওয়ালা ওই রোগা লোকটা নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ ধরে তার দিকে চেয়ে আছে, এই মাত্র তাকে দেখে ও চমকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বিজন ভাবল। একটু ভাবতেই বুঝতে পারল যে, ও দেখছিল।

লোকটা নামল কয়লাঘাট স্ট্রীটে, বিজনও নেমে পড়ল।

নেমেই বলল, 'দেশলাই আছে?' লোকটার কাছে, আশ্চর্য, ছিলও। হাতের ফাঁকে পুরো কাঠিটা জ্বলে যাবার পর, নিভে যাবার আগে বিজন সিগারেটটা ধরাল ও ততক্ষণ ধরে ভ্রূ-দুটো নামিয়ে নিয়ে লোকটাকে দেখল। বিজনের গালটা চিনচিন করতে লাগল। গালের রুজ তুলতে ভুলে গিয়ে অন্যমনস্ক অভিনেতা থিয়েটার থেকে অনেকদূর চলে আসার পর যেমন বিব্রত বোধ করে, বিজনও সেইরকম কমপ্লেক্স বোধ করল।

লোকটা চৌরাস্তার মোড় অবধি ক্রমশ ছোট্ট হতে হতে মিলিয়ে গেল। একবারও ফিরে তাকাল না। লোকটা খোঁড়া নাকি?

বিজন ঠিক করেছিল, আজ রাত পর্যন্ত সারাদিনটা সে রেণুর বাড়িতেই কাটাবে। সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউ থেকে অবিনাশ কবিরাজ লেনে ঢোকার মুখে তার যা-একটু লজ্জা করবে, এপাশ-ওপাশ দেখে নেবে একবার। কিন্তু গলির ভিতর খানিকটা অগ্রসর হতে হতে ক্রমশ, এবং ৪নং বাড়ির চৌকাঠে পা দেবার আগে সে নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচ বোধ করবে। যেন, এই দ্বিতীয়বার সে এ-বাড়িতে এল না, বহুদিন ধরে আসছে। প্রকৃতপক্ষে, একতলায় কড়া নাড়ার আগে সে মনে করে নেবে ভেবেছিল যে, যেন ন' পিসিমা বা সুকুমারের বাড়িতে ঢুকছে।

বিজন ভেবেছিল, রেণুকে না জানিয়ে একেবারে বাজার

করে নিয়ে ঢুকবে। রেণুর সামনে থলেটা উপুড় করে দিলে সে অবাক হয়ে বলবে, 'ওমা, এ কী! বললেন না কেন, কত-কী আনতে বলতাম।' কত-কী কথাটার মানে তাহলে এইভাবে করে নেবে, বিজন ভেবেছিল যে, রেণু যেন, জানিয়ে গেলে, আলু-পটল কি মাংস-পেঁয়াজের সঙ্গে, বাজার থেকে তাকে কয়েকগাছা কাচের চুড়ি কি একটা ভাল রুমাল বা দামি একটা সাবান আনতে বলত। রেণুকে, সে ভেবেছিল, রাঁধতে বলবে; দুপুরে যে-ঘণ্টাখানেক রেণুর সঙ্গে শুয়ে থাকবে, তার একটি মুহূর্তও অপব্যবহার করবে না, তারপর নিজে অল্প ঘুমিয়ে বা ঘুমন্ত রেণুকে ঘরে রেখে, তিনটে-চারটে নাগাদ সে একবার অফিসে যাবে ঠিক করেছিল।

বিজন বারোটার আগেই অফিসে গেল। এর আগে তার কখনো লেট হয় নি, আজ পি. এ-র ঘরে গিয়ে সই করতে হল। হরিকান্তবাবু মোটাগোছের নন, বেশ রোগাই, কিন্তু বিশেষ নড়াচড়া করেন না। হরিকান্তবাবু চুলে কলপ মাখেন, মাথাটা পাকা তালের মত, লম্বা লম্বা মাথা-ভাঙা কানের ভেতর থেকে ঝুলে রয়েছে কয়েকগাছি চুল, যেন দুটো জামরুল গোঁজা দু'-কানে—তাঁর মুখ থলথলে, চোখ ব্লেড দিয়ে চিরে দেওয়া—আসলে, কৃতি ও তৃপ্ত মানুষগুলির মুখে যে একটা রগড় আছে, হরিকান্তবাবুকে না দেখলে তা বোঝা যায় না। চশমাটা কপালের ওপর তুলে দিয়ে তিনি চেয়ারে হেলান দিয়ে পড়ে-ছিলেন। বিজন চলে আসছে, এমন সময় ফকফক করে বললেন, 'কী মশায়, দেরি হল?'

'এই, এমনি।' বিজন জানাল।

'কোনো বিপদ?' আবার ফকফক আওয়াজ শুনে বিজনের

টেবিলের ওপর চোখ পড়ল। পেন-হোল্ডারে কানে সুড়সুড়ি দেবার পালক, তার পাশে একটা মোটা ফাইল রয়েছে টেবিলে; বেশ ভারি হবে, বিজনের মনে হল।

এস্ট্যাবলিশমেণ্টের সুপ্রভাত কী-একটা ছুটিছাটার বিষয়ে ও একবার একটা স্ট্রিকচারের ব্যাপারে ওর পার্সোনাল ফাইল খুব তাড়াতাড়ি মুভ্ করিয়ে দিয়েছিল বলে, তার জের টেনে সে বিজনের বন্ধু। বিজন তার পাশের সিটে বসে বলল, 'বোধ হয় তাকে ছুটি নিতে হবে, হয়ত তার কোনো গুরুতর অসুখ করেছে, বলে সে একটা গুরুতর অসুখের নাম করল।

'সে কী মশায়, তাহলে তো চাকরি যাবে!'

'কী!' বিজন ফ্যালফ্যাল করে ওর দিকে চেয়ে রইল। এত আহত সে বহুদিন বোধ করে নি। কী কথার কী উত্তর! সে নীরবে বলতে লাগল, আমার অসুখের নাম শুনে, হ্যাঁ খুব ছোঁয়াচে, বাঁচব কি মরব ঠিক নেই, কিন্তু ওই তুচ্ছ কথাটা মনে হল আপনার! আমার যদি ওই অসুখই হয়ে থাকে, তাহলে চাকরি যাবে কি যাবে না···

'কী বলছেন?' বিজন জিজ্ঞাসা করল।

'না। বলছিলাম যে—' বিব্রত গলায় অথচ যেন সত্যি সত্যি বলছে, এমন ভাবে সুপ্রভাত জানাল, 'মানে, ছুটি নিতে হবে তো অনেকদিন, উইদাউট-পে হয়ে যাবেন শেষ পর্যন্ত, ফিট-সার্টিফিকেট দিয়ে তবে জয়েন করতে পারবেন, তারপর ধরুন না—'

বিজন অবিকল ওর দিকে একভাবে চেয়ে আছে দেখে, 'দূর মশায়, আপনার কিছ্ছু হয় নি, যত্তসব—হ্যাঃ—' 'দূর মশায়'-টা বেশ জোরের সঙ্গে এবং ভালবেসে 'কিছ্ছু হয় নি' উচ্চারণ

করতে পেরে, পকেটে রুমাল খুঁজতে গিয়ে একটা সবুজ রঙের প্লাস্টিকের চিরুনি বের করে ফেলে, সুপ্রভাত চুল আঁচড়াতে শুরু করে দিল।

সাতের-ডিভিশনে গিয়ে বিজন দেখল ঘরে কেউ নেই, তিনের-ডিভিশনে চৌধুরি, প্রমোদবাবু, নিমাই ও রাসবিহারী, কেন কে জানে, আজ সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করছে। ডিভিশনাল ক্লার্ক প্রফুল্লবাবুকে ফিসফিস করে একজন বলছে, 'একটা উপায় করুন দাদা!' রাসবিহারী বলছে এবং বাকি সবাই সব বিষয়ে ওর সঙ্গে একমত হচ্ছে। অবশ্য, মধুসূদনের সনেট সম্পর্কে ঈষৎ অমিল রয়েছে। কীট্‌স এবং ফ্যানী ব্রাউনের প্রেম-সম্পর্কে রাসবিহারী দু'কথা বলল, বুদ্ধদেবের অমুক কবিতা আসলে বোদলেয়রের অনুবাদ, বলল, অপ্রত্যাশিতভাবে কীট্‌সএর দু'লাইন 'কোট' করল। ভুল, বিজন না পড়ে থাকলেও বুঝতে পারল।

হঠাৎ বাইরে ইলেকট্রিক এঞ্জিনের তীব্র সিটি বেজে উঠল। রাসবিহারী বিজনের দিকে ফিরে বলল, 'এই যে। আচ্ছা, এই সিটি শুনলে আমার কী মনে হয় জানেন?'

'কী?'

'কী-রকম বলুন তো এই আওয়াজ। দশ-সেকেণ্ডের মধ্যে বলতে হবে কিন্তু, ইশ, বলতে পারছেন না,' রাসবিহারী আপ-সোস করল, 'হোয়াট এ পিটি!'

'কী?' বিজন আবার জিজ্ঞাসা করল, গলার স্বর না পাল্টে।

'ঠিক শাঁখের মত, নয় কি?' রাসবিহারী তৃপ্ত হাসল, 'শুনলে মনে হয়, যন্ত্র যেন তার জয়ধ্বনি করতে করতে ছুটে যাচ্ছে।'

'চলুন যাই।' একটা প্রশ্নবোধক হাসি হাসল রাসবিহারী, যেন বলছে, কেমন দিলাম!

বিজন ও রাসবিহারী চা খেতে গেল।

রাসবিহারী সব সময়ই তার শারীরিক অসুস্থতার কথা বলত, বিজন ভাবত নিউরোসিস, শেষের দিকে সন্ধ্যাবেলার জ্বর ও ভোরবেলার বুক-ধড়ফড়ানির কথা বলতে গিয়ে এমন যন্ত্রণা ফুটিয়ে তুলত মুখে যে, বিজন ধরে নিয়েছিল, ও সত্যিই অসুস্থ। রাসবিহারী যখন একমাস ছুটি নিল, বিজন ক্রমাগত ওর জন্য সহানুভূতি বোধ করেছিল। আজ রাসবিহারী রেস্তরাঁয় বসেই, 'সুস্থ আছি,' 'নেভার ফেল্ট বেটার,' 'বুঝলেন বিজনবাবু,' 'ভোরে দুধ খান পোয়াটাক, আর সন্ধেবেলা দুটো ডিম, তাহলেই দেখবেন—' বলে, তারপর মেয়েদের স্তন পাছা ইত্যাদি নিয়ে নপুংসকের খিস্তি সুতরাং অশ্লীলতা করতে করতে, পর-পর দু'বার, 'জানেন, আমি একটা সাংঘাতিক কাব্যনাট্য লিখব,' জানিয়ে উত্তর না পেয়ে, 'আমি কি কাব্যনাট্য লিখতে পারব না বলে মনে করেন—' জিজ্ঞাসা করায়, 'আপনি কোনোদিন কিছু লেখেন নি ও ভবিষ্যতেও কিছু লিখতে পারবেন না,' বিজনের এই অন্যমনস্ক ও উদাসীন উক্তিতে ধীরে ধীরে ক্ষেপে গিয়ে তাকে অনেকক্ষণ ধরে যথেষ্ট অপমান করল, অপমান করার সমস্ত সময়টা ধরে বিজন তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল নির্বাক, শুধু এই কথা ভাবতে ভাবতে যে, আমি কি ক্লীব, আমার কি আত্মসম্মান নেই এবং আমি কেন রেগে উঠছি না? অনেক আশা ছিল যে এইবার, এরপরেই সে রেগে উঠবে। একবার যদি দৈবক্রমেও রেগে যায়, তাহলে, যদি কটূক্তির কথা ওঠে, বিজন জানে, তাকে চেষ্টা করতে

হবে না, জিভে নিপুণতম শব্দ তার এমনিই আসবে, ওর দুর্বলতম জায়গাতে আলপিনের পুরোটা ফুটিয়ে, চুপচাপ চেয়ারে হেলান দিয়ে কুঁড়ের বাদশার মত তারপর সে শুধু ওর কাৎরানি দেখবে।

আশ্চর্য হয়ে গেল বিজন, তার রাগ হল না। রাসবিহারী অবশ্য পরে নিজেই ক্ষমা চাইল, বুঝেছে যে সব দোষ ওর, ওর অসুস্থতার। বুঝতে পেরেছে বলল যে বিজন সত্যি সত্যিই তা বলতে চায় নি।

রাসবিহারী উঠে গেলে বিজন রাস্তার দিকে চেয়ে রইল। তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে, বাইরে রাস্তায় অফিস-ফেরত জনতার ভিড়, ওপারে শিবপুরের কাছে একটা লম্বাটে মুখের মত সূর্য ঝুলে রয়েছে।

বিজন রেস্তরাঁয় বসে রইল। পাখাটার দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ মনে হল তার, আরে, পাখার মুণ্ডটা যে এমন কারুকার্য-করা, এতদিন এসেছে, কই, তার চোখে পড়ে নি তো। কেন সে দেখে নি এতদিন! বিজন বড্ড কষ্টবোধ করল। কাল থেকে কতদিন আবার আসবে না, হয়ত কোনোদিনই আসবে না আর, কেন সে আগে বহুদিন ধরে পাখাটা দেখে রাখে নি! ছেলেবেলা থেকে আয়নাই দেখেছে শুধু, কিছুই তার চোখে পড়ে নি, ব্যাধির কথা তার মনে থাকে নি। নইলে কীসের ভুলে, কার ওপর অভিমানে, সে কাপের পর কাপ চা খেয়ে, সারারাত ধরে মদ খেয়ে, একটা সিগারেট থেকে আর-একটা ধরিয়ে নিয়ে, স্বাস্থ্য খরচ করে করে—হ্যাঁ, অসুখটা তো সে নিজেই ডেকে এনেছে। অথচ, তার মধ্যেও ব্যাধি রয়েছে অনিবার্য, এই বোধ সে কী করে বিস্মৃত হয়েছিল? তাহলে, সে কাউকে

ভালবাসে না, নিজেকেও না, পঁচিশ-বছর বয়সের তার এই যন্ত্রণা, এ কত মিথ্যে হয়ে যেত! বিজনের মনে হল, রাস্তা দিয়ে এই যে অফিস-ফেরত কেরানীরা যাচ্ছে হুড়হুড় করে, যারা ভুল জীবন কাটাচ্ছে, যাদের জীবনে আর কিছুই হবার নেই, যা কতকগুলি মাস-পয়লা অর্থাৎ মাইনের দিনের মধ্যে খণ্ড খণ্ড একটা ব্যাপার—এই যে জীবন, এও কত গুরুত্বপূর্ণ, যদি তা মৃত্যু-সম্পর্কে চেতনার দ্বারা শৃঙ্খলিত হয়। এইসব লোক, এরা প্রত্যেকে বীজের মত এক-একটা মৃত্যু নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এরা প্রত্যেকটি লোক আলাদা, কারণ এদের প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে তার নিজস্ব এবং আলাদা আলাদা মৃত্যু, বিজনের ইচ্ছে হল, সকলকে ডেকে ডেকে সে এই কথা বলে ; হ্যাঁ, নতুন কথা বৈকি, অনেকেই শুনলে অবাক হয়ে যাবে। কেউ কেউ আপত্তি তুলে বলতে পারে, তোমার মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছে, তুমি গুরুতর অসুস্থ, তুমি অস্বাভাবিক, তাই তুমি এ-কথা বলছ। তাই কী? 'না,' বিজনের ব্যথিত দুইচোখে তাকিয়ে বিস্ফারিত স্বরে সে বলে উঠল, 'তা নয়।' সে অতি সাধারণ মনের লোক ছিল বলেই জীবন-সম্পর্কে সব চেয়ে যা স্বাভাবিক, তা জানার জন্য এই অস্বাভাবিকতা পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। যে-কোনো উপায়ে এ তার আগেই জানা উচিত ছিল। কিন্তু এখন, যখন সে জানে, তার অসুস্থতার জন্যই জানে, সে সকলকে তা জানাতে চায়। এদের সকলেরই তো অসুস্থতার আগেকার সেই অস্বাভাবিক অবস্থা, যখন সে তার প্রতিটি প্রশ্নের একটিরও উত্তর পায় নি! আজ একটির পেয়েছে। আজ সকালে বেচুকে ডেকে সে বলতে পারত, 'বেচু, তোর কী উচিত জানিস? তোর উচিত সবসময় চোখ নামিয়ে, নিচু গলায় আর হেঁটমুখে

কথা বলা, যেমন, যখন তুই মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে থাকিস। কী ডিগ্‌নিটি এই অসুস্থতার, জীবনের সঙ্গে তারই শুধু ক্ষমাহীন সম্পর্ক, মৃত্যুর কথা মনে রেখে, বেচু, তোর ঘুমঘোরে প্রতিটি কাজ করা উচিত।'

অথচ অন্যদিকে, বেঁচে থেকে পড়ন্ত আলোয় হাঁটাহাঁটি করছে এইসব নারী ও পুরুষ—এই শুধু-বেঁচে-থাকাটুকুই কত উপভোগ্যতার! কিন্তু সে যাই হোক, বিজনের চোখে তবু জল এসে গেল এই ভেবে যে, সে কেন দু'-এক বছর ধরে এই রেস্তরাঁয়, এই কারুকার্য-করা পাখাটার নিচে বসে রইল না, অন্তত বসে থেকে, চায়ের পেয়ালায় চামচ নাড়তে নাড়তে, বার বার শুধু-বেঁচে-থাকা লোকগুলোর সহসা-বিকেলবেলার এই নীরব হাঁটাহাঁটি লক্ষ্য করে যেতে পারল না! চশমাটা খুলে ফেলে বিজন বার বার তার কাচ মুছতে লাগল।

রাস্তায় বেরিয়ে বিজন একটা ক্যাপস্টান কিনল। আজ সকাল থেকে সে সিগারেট খায় নি। কিনেই বিজন ভাবল, এহে, দুটো কিনলেই হত, মিছিমিছি এক নয়া-পয়সা গেল। কিন্তু সিগারেটটা দড়িতে ঠেকাতেই, এ কী হল বিজনের, রেণুর নগ্ন দেহটার জন্য সে আপাদমস্তক কামনা বোধ করল।

একতলায় সিঁড়ির নিচে শেফালির মা শুয়ে ছিল। তিন-তলায় উঠে যার সঙ্গে দেখা হল, কী নাম মনে পড়ার আগেই লোকটা, 'কী মোসাই, কোতা চিলেন এ্যাদ্দিন?' বলে ওঠায়, গলার স্বর শুনে বিজনের মনে পড়ল, ভদ্রলোকের নাম বর্মন।

বর্মন বললে, 'পথ ভুলে নাকি ?' বিজন বলল, 'না, পথ চিনেই এলাম।'

এই ভরা সন্ধ্যেবেলায় বর্মন বাঁ-চোখ টিপে বললে, 'বেশ করেচেন। তারপর, রেণুর কাচে ?'

'লোক আছে ?'

'লোক ? দেখুন গিয়ে।' রেলিঙে হাত রেখে বর্মন নিচে নামতে লাগল, 'কাল থেকে খিল মেরে পড়ে আচে। মাচের মত মাল খাচ্চে মোসাই, দু'দিনে বোতলদশেক ওপরে গিয়েচে।' বর্মন তার নিরপরাধ মুখ ঘুরিয়ে জানাল, 'শেফালির কাচেই শুনচিলাম।' বলতে বলতে বর্মন নিচে নেমে গেল।

বিজন ওপরে উঠতে লাগল।

ছাদের কোণে খাতুনের ঘরে আলো জ্বলছে। এদিকের ঘরটা রেণুর। দরজায়, কই, খিল দেওয়া নেই তো। কলের নিচে গোপাল বাসন মাজছিল, বলল, 'মা ভেতরে আছেন।'

পর্দা তুলে ভিতরে ঢুকে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল বিজন। ঘরে কোনো আলো জ্বলছিল না, একখণ্ড দেওয়ালের মত বিরাট আয়নাটার ওপাশেই, যেন রাস্তায় আলোয়, রেণু শুয়ে আছে উপুড় হয়ে। রেণু ঘাড় ফিরিয়ে বিজনকে দেখল। ইশারা করে তাকে পাশে বসতে বলল। পাশে বসে বিজন ওর ওপর হাতের সাপমুখো বলয়টা দেখতে লাগল। ধাবমান সাপের মত আঁকা-বাঁকা ঠিকই, কিন্তু আজ কি বিজনের সবই অন্যরকম মনে হবে ? বিজনের মনে হল, খুব উঁচু থেকে সে যেন একটা পাহাড়ী নদী দেখছে।

শব্দহীন ঘরে রেণু উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে, মাঝে মাঝে তার চুল ও ঘাড় স্পর্শ করল, যেন সেখানে চুম্বন ছিল, যেন বা

স্বগতোক্তি করছে। তখন, বিজন তার চুল ও ঘাড় স্পর্শ করতেই, হাউহাউ করে কেঁদে উঠল রেণু। উঠে বসে কোমর জড়িয়ে ধরল বিজনের। ওর বুকে মুখ ঘসড়াতে লাগল, কোলে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল। বিজন লম্বা ও প্রকাণ্ড আয়নাটায় তাদের দু'জনের ছবি দেখতে দেখতে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছিল রেণু?'

রেণু অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল। তারপর যখন মুখ তুলল, এলোচুলে, কান্নায় ফোলা, অশ্রু আর কফে ও মদের গন্ধে মাখামাখি—ওই মুখটাই তুলে ধরল। 'আচ্ছা, আমি কি চোর?' বলল, 'আমি কি চুরি করতে পারি?'

শায়ার দড়িটা দাঁতে চেপে দোতলার শেফালি ঘরে ঢুকে পড়েছিল। বিজনকে দেখে, 'ওমা,' বলে তিড়িং করে লাফিয়ে বাইরে গিয়ে, ফের শায়া পরেই ঘরে ঢুকে বলল, 'ওমা, আপনি! কার কাছে খবর পেলেন? বলুন তো একটু বুঝিয়ে, কী-এমন হয়েছে বলুন না, যে নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ করতে হবে?' বাইরে মিনিট-খানেক ধরে রগড়ে মুখ থেকে কী তুলতে চেয়েছিল সেই জানে, শেফালি আয়নায় তার ছুলিধরা টকটকে মুখটা দেখতে লাগল। একবার চোখের একটা পাতা টেনে নামাল, দেখল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে আয়নায় নিজের পেছনটা দেখতে দেখতে বলল, 'কী মালই খেতে পারিস বাবা!'

'আপনি তো ছিলেন সেদিন, দেখেছেন তো লোকটাকে?' জিজ্ঞেস করেই শেফালি সচকিত হয়ে উঠল, জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'কিরে মীরা, তোর হল ভাই?'

বিজন লোকটাকে দেখেছিল বৈকি। তবে সপ্তা' তিনেক

আগের কথা, ভাল মনে নেই। লোকটা আসতে গোপাল বাইরে থেকে ডাকল, 'মা', ভয় ও উৎসাহে চমকে উঠে রেণু বলল, 'ওই, লোক এসেছে,' দরজার কাছে উঠে গিয়ে গোপালকে বলল, 'একটু দাঁড়াতে বল, ছাদে চেয়ারটা পেতে দে,' বিজনকে বলেছিল, 'নইলে, ফিরে যাবে। কত লোকসান খাব আপনার জন্যে। খামকা বসে রইলেন, কথাবার্তা বললেন। এখন তাড়াতাড়ি নিন দেখি।'

উঠে দাঁড়িয়ে বিজন বলেছিল, 'না, আমি আজ যাই। আর একদিন আসব।' বিজনের অত্যধিক শান্ত স্বর শুনেই রেণু বলেছিল, 'কেন, নয় একটু দাঁড়াবে,' নইলে বলত না। বিজন সে কথা শোনে নি।

দু'জনের কেউই জামাকাপড় খোলে নি, রেণু নীল আলোটা নিভিয়ে নিয়ন জ্বালাল, খিল খুলে সরে দাঁড়াল একপাশে, কিন্তু পর্দা তুলে বেরুতে যাবে বিজন, অপরিচিত লোকটা ওর দু'কাঁধে দু'হাত রেখে জড়িতস্বরে বলে উঠল, 'আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো?'

বিজন দেখল একজন বুড়ো লোক। ভদ্রলোককে দেখে, কেন কে জানে, তার রাঁচির কথা মনে পড়ল। সে বলল, 'আমাদের রাঁচিতে আলাপ হয়েছিল।'

'রাঁচিতে, রাঁচি ছিলে, না? আরে, আসুন মশায়, যাচ্ছেন কোথায়, ও রেণু, এ যে আমাদের চেনা লোক হে। কদ্দিন আসছেন তোমার কাছে—'

ভদ্রলোক একজন পদস্থ সরকারী কর্মচারী, বিজন জানতে পারল। কিছু পরে মদ এল। শেফালিকে ডাকিয়ে আনা হলে, কষা মাংস এল। শেফালির সঙ্গে এল বর্মন। 'দুটো

নইলে জমে ?' হাড়ের নালি থেকে সকসক করে শাঁস টেনে নিলেন সরকারী কর্মচারী, বিজনের হয়ে সম্মতিসূচক ঘাড় হেলিয়ে বললেন, 'চলে তো আপনার,' শেফালি দ্বিতীয় চুমুকে মেরে দিয়ে ঠক করে গ্লাসটা ট্রে-র ওপর রেখে বলল, 'ফাঁক !' —এমন সময় ঘড়িতে ঢঙ্-ঢঙ্ করে আটটা বাজার সময় জুড়ে গম্ভীর ও সুরেলা গলায় দোরগোড়ায় ফুলওয়ালা হেঁকে উঠল, 'চাই বেলফু উ-উ-উউল !'...

'অ্যা—অ্যাই ! ঠিক ধরেছেন, ওই লোকটাই। আপনি তো খানিক পরেই চলে গেলেন, অ্যাঁ ? পরদিন মিনসে কী বলে জানেন ? ওর নাকি পাঁচশো টাকা চুরি গেছে। ইকি কাণ্ড বলুন দেখি, অ্যাঁ ?' শেফালি জানতে চাইল।

বিজনের গালটা ফের চিনচিন করতে লাগল। সেদিন রেণুর কাছ থেকে যাবার পর, বোধহয় পরদিন ভোরবেলা থেকে তার বুকে একটা ব্যথা হয়, একটা মালা থাকার জায়গা জুড়ে ব্যথাটা এখনো রয়েছে। বিজন বার-দুই কাশল, কাশির শব্দটা মন দিয়ে শুনতে গিয়ে সে ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। কী-রকম অদ্ভুত কাশি হচ্ছে তার—কী অমানুষিক...

হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠে রেণু ওর গলা জড়িয়ে ধরল, 'আমি কি চোর, আপনি তো ছিলেন। আমাকে চুরি করতে আপনি দেখেছেন ?'

বিজন চমকে উঠল, কিন্তু ওর চোখের দিকে চাইল না কিছুতেই ! এলোচুল, সিকনি আর চোখের জলে মাখামাখি চৌকোগোছের একটা মুখ, চোখে লালের ছাট, চোখের কোল দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে রাত্রির কাজল, গা দিয়ে দিশি মদের গন্ধ

ছাড়ছে ভুরভুর। ওর চোখের দিকে বিজন এখন তাকাবে না। না, বিজন অনুমানে বুঝল, ওর চোখে এখন প্রেতিনির চাউনি।

'কী লো মীরা, তোর হল?' জানালা দিয়ে একতলার দিকে মুখ নামিয়ে শেফালি আবার চেঁচিয়ে উঠল। তারপর বিজনের দিকে ফিরে, যেন কী গূঢ় মানে আছে কথাটার এমন-ভাবে হেসে বলল, 'যাই। চান করব!'

'আমাকে দু'দিন হাজতে রাখল।' বিজনের বুকে মুখ রগড়াতে রগড়াতে ফোঁপাতে লাগল রেণু, 'খিস্তিখেউড় করল। বুক জ্বলে গেল, তবু মদ খেতে দিল না।'

'বড়বাবু আমাকে লাথি মারল,' কোমর দেখিয়ে রেণু বলল, 'এইখানে।'

রেণু শুধু শায়া পরে ছিল। শায়াটা হাঁটুর ওপর উঠে গিয়েছে, একটা পায়ের উরু পর্যন্ত দেখা যায়। ব্লাউজের নিচের বোতামটা খোলা, রেণুর ঝোলা স্তন দেখা যাচ্ছিল, স্তনের বোঁটায় শ্বেত-অশ্রুর মত জমাট দুধ। রেণুর স্তন ও উরুর রঙ একই রকম, বিজন লক্ষ্য করে দেখল। ঘুমন্ত শশকের গায়ে যেন হাত রাখছে, বিজন ওর উরুতে হাত রাখল। সেদিন তাকে চলে যেতে হয়েছিল, আজ সুদে-আসলে উসুল করবে, এই জন্যই তো সে এসেছে। এই নিয়ে দু'দিন এল, অথচ এখনও ওর ব্লাউজের সবক'টি বোতাম সে খুলতে পারে নি। রাস্তার দড়ির আগুনে যখন সিগারেটটা ঠেকিয়েছিল, বিজন সেই মুহূর্তের মত উত্তেজিত হবার চেষ্টা করতে লাগল।

এদিকে গলাকাটা ছাগলের মুণ্ডুটার মত ছটফট করছে রেণু। মাঝে-মাঝে বলছে, 'ওরা নিক না। আমার আলমারি, ড্রেসিং-টেবিল, সব বিক্রী করে টাকা নিয়ে নিক।'

বিজনের গালটা গলা-কাটা রক্ত লেগে লাল হয়ে উঠছে। সে রুমাল দিয়ে মুখ মুছল।

'বলুন আপনি, কে চুরি করেছে?'

বিজন নিঃশব্দে ওর ব্লাউজের বোতামটা পরিয়ে দিল। গাল-দুটো চিন-চিন করছে অসহ্য। জ্বর হয়েছে নাকি তার!

আচম্বিতে রেণু উঠে বসল ধড়মড়িয়ে, 'কে চুরি করল তাহলে? আপনি জানেন কে চুরি করেছে?'

প্রশ্ন দুটো যেন আঠা-লাগানো দুটো রুজের প্যাড, পট-পট করে তার দু'গালে সেঁটে দিল রেণু। আগুনের ঘর থেকে অন্ধ মানুষ যেমন করে প্রশ্ন করে, 'কী হল?' তেমনি ব্যাকুল হয়ে উঠে রেণু জিজ্ঞেস করল, 'কে চুরি করল?'

বিজন এবার রেণুর গালে হাত রাখল। তার হাত থরথর করে কাঁপছে। দাঁতে-দাঁত চেপে বিজন বলল, 'না, তুমি চুরি করোনি।' কিন্তু তার গলা কেঁপে গেল কেন?

সেই কখন সন্ধ্যার মুখে এসেছে বিজন, এখনো পর্যন্ত সে এই স্বরে কথা বলে নি। এই স্বর রেণুর বড় চেনা। সে টের পেল। টের পেয়েই আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে নেবার চেষ্টা করল, তখুনি নড়েচড়ে শুল। হাসিও টেনে আনল ঠোঁটে। কিন্তু বিজন তা দেখতে পেল কৈ। তার চোয়াল নড়ছে, শক্ত হয়ে যাচ্ছে মুখটা, যেন রেণুর মুখটাই কাঁপছে থরথর করে, বিজনের দু'হাতের দশটা আঙুল রেণুর গালের ওপর চেপে বসে যেতে লাগল।...

বিজনের ম্লান দুইচোখে সে রেণুর দিকে তাকায়।

এই মুখ, হ্যাঁ, কান্নায় ফোলা, চোখের কোল দিয়ে গলে পড়ছে তরল পিচের মত নিষ্প্রভ কাজল, সিকনি আর চোখের

জলে মাখামাখি, এলোচুলের ঠিক এই মুখটাই সে আগে কখনো দেখেছে কি? বিজন অনুভব করল, সে দেখেছে, কিন্তু কোথায়! মনে করার আকুল ইচ্ছায় বিজন উন্মুখ হয়ে উঠল, দেখতে দেখতে দূর থেকে দুলতে-দুলতে এগিয়ে-আসা একটা ঢেউএর মত ছুটে এল স্মৃতি, বিজনের সমস্ত অস্তিত্বকে নিয়ে ফেঁপে উঠে, তারপর খুবই কাছে তা ভেঙে পড়ল। কিছুতেই মনে পড়ল না। মনে পড়ল না, কিন্তু বিজন বুঝতে পারল, বড় ভয়ঙ্কর সেই স্মৃতি।

অথচ বেশি দূরে নয়, ঘরের অন্ধকার থেকে ভেসে উঠছে ঠোঁটদু'টি, কাছেই কাঁপছে। এখনো গ্লাস, গঁদের শিশি, আলমারিতে শূন্য বোতল, কাঁচি, পাপোষ, বৃষ্টি শেষের পিচের রাস্তায় ঠিকরানো গ্যাসের আলোর মত কালো আয়নার একটা অংশ, তাতে জলভর্তি গ্লাস ও পাপোষ, তাতে ভিজে বেলফুল, তাতে গঁদের শিশি ও আলমারিতে শূন্য বোতল, নীল সাপ, লতা ও পদ্ম-আঁকা একটা চীনা ফুলদানী, এই সব দেখা যাচ্ছে। একটু পরে ঠোঁট-দু'টিই শুধু ভাসবে, আর সব ডুবে যাবে। ক্রমশ লাল হয়ে উঠছে, অন্ধকার রঙের একটা তুলি বুলিয়ে বার বার লাল করে দিচ্ছে ঠোঁটদু'টি, যেন দু'টি ফুলের পাপড়ি, কী ফুল, নিমজ্জমান ব্যাকুলতায় বিজন প্রাণপণে স্মৃতি হাতড়াতে লাগল। খুব জানা ফুল, কী নাম যেন ফুলটার···অথবা, হঠাৎ মনে হল বিজনের, এ যেন একটা লাল ফড়িং বসে রয়েছে ঠোঁটে, দু'আঙুলে এখুনি চেপে ধরলে যার ধুলোমাখা পাখনাদু'টি ঘনঘন শিউরে উঠবে!

না, মনে মনে, যেন স্বপ্নে বিজন চিৎকার করে উঠল, না! ভালবাসে না, ভালবাসা নেই এমন দু'টি ঠোঁটে সে চুমু খাবে কেমন করে।

বুক খালি বিজন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, আঃ! 'কী গরম,' রেণু বলল।

বিজনের চোখের সামনে একে একে গঁদের শিশি, আয়না, শূন্য বোতল, ফুলদানী, গ্লাস, কাঁচি, পাপোষ, গ্লাসে বেলফুল, এই সব ভেসে উঠতে লাগল। ফুলগুলো বাসি, বিজন দেখল। বিবর্ণ হয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'সেই ফুল, সেদিনের?' বোধ হয় তার গলা দিয়ে স্বর বেরোয় নি ভয়ে, দু'হাতে ওর বুকে মৃদু ঠেলা দিয়ে চাপা কামনাকাতর গলায় রেণু বলল, 'একটু সবুর করুন না, আঃ!' হাসি-হাসি মুখে জিজ্ঞেস করল, 'নীল আলোটা জ্বালিয়ে দিই?'

নীল আলোটা জ্বালিয়ে, বুকটা এমন টান করে চিতিয়ে দাঁড়াল সে, যে, বডিসের স্ট্র্যাপে সেলাই ছেঁড়ার আওয়াজ শুনতে পেল বিজন। সমস্ত চুল খুলে ফেলে টান করে বাঁধতে লাগল রেণু, রেণু ব্লাউজের প্রথম বোতামটায় হাত রাখল।

এই প্রথম বিজন ওর আঙুলের নড়াচড়া লক্ষ্য করল। আঙুলে মরা মাংস, বুড়ি কাকাতুয়ার মত বাঁকা, চামড়া-ঢাকা গাঁটগুলো কী স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, রেণুর নোখগুলো বিজন দেখতে পেল না।

'না!' আততায়ী ছুরি হাতে সামনে এসে দাঁড়ালে যেমন হয়, বিজনের সেইরকম, স্বপ্নের সেই বদ্ধমূল ভয় হল। তার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে না, তার বুকে পাথর···

'কী হল আবার!' রেণু জিজ্ঞেস করল।

'না।' বিজন বলল।

'আপনি খুলে দেবেন?' নিতম্বটা অর্ধেক ঘুরিয়ে, যেন

শরীরটাকে উথলে দিয়ে দারুণ কটাক্ষ করে রেণু জিজ্ঞেস করল, 'দেবেন নাকি, খুলে?'

সহসা বিজন ফ্লুরেসেণ্ট ল্যাম্পটা জ্বেলে দিল। তিন সপ্তাহ আগের না-পাল্টানো উল্টে-যাওয়া ফুলদানীর জলের মত ভারি আলোয় ঘর ভরে গেল। বেশ্যাপটির মাঝখানে উজ্জ্বল আলোর এই ঘর, ঘরের মাঝখানে পুরু গদীর বিছানা, দেওয়াল জুড়ে আয়না, দেওয়ালে ঝুলন্ত ঈশ্বরের ছবি, সবকিছুর মাঝখানে পুরুষানুক্রমে বেশ্যা রেণুকে দেখে বিজন এবার চিনতে পারল।

'না।' হাতের মুঠো শক্ত করে রেখে বিজন বলল, 'আমি যাব।'

'সে কী!' রেণু বলল সন্দেহের হাসি হেসে।

'এই নাও টাকা।' বিজন ওর দীর্ঘ, কংকালসার হাতটা রেণুর দিকে বাড়িয়ে দিল। মুঠি খুলে ধরল।

আর এক মুহূর্ত দেরি হলে কড়া নড়ে উঠত, দরজাটা দু'হাট করে খুলে ফেলতেই অকস্মাৎ সর্বাঙ্গ বিদ্যুতে ঝলসে গেল বিজনের, সে আর চৌকাঠের বাইরে পা বাড়াতে পারল না, দু'হাতে পাল্লা দুটো দেওয়ালের সঙ্গে ঠেসে ধরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

যেন, অপ্রত্যাশিত কিছু নয় তবু। বাসের সেই খোঁড়া লোকটা! গোড়ালির কাছে দু'পা মুড়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে সে দাঁড়িয়ে, ভ্রূ অবধি নামানো ফেল্টের টুপি, লম্বাটে মুখের থুতনিটা বুকের কাছাকাছি, এখন তার গায়ে একটা ভারি ওয়াটারপ্রুফ। সপসপে ওয়াটারপ্রুফটার দিকে চেয়ে চেয়ে বিজন ক্রমশ বৃষ্টির শব্দ পেল, তুমুল ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে,

সোঁ-সোঁ করে হাওয়া চালাচ্ছে বেশ, বিজনের গালে বৃষ্টির উড়ন্ত একটা ঝাপ্টা এসে লাগল।

লোকটা চুরোট খাচ্ছে। চুরোটের আগুনে মৃত লোকের স্ট্যাচুর মত ওর মুখের বাঁ-দিকটা বার বার প্রতিভাত হচ্ছে, বিজন ওর জীবন্ত চোখের দিকে চাইল। লোকটা চোখ ফিরিয়ে নিল না, দেখার সুযোগ দিল, ওর চোখে চোখ রেখে মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে রইল। মাটিতে পোঁতা একটা শক্ত গাছের মত বিজনও দাঁড়িয়ে রইল ওর চোখে চোখ রেখে, মুখোমুখি, শুধু তার শেকড় ভয়ে সড়সড় করতে লাগল। রাস্তায় একটা কুকুর ডাকল। আর একবার ডাকল। লোকটা দু'বার কাশল। কাশিটা অমানুষিক, অনেকটা ছাগলের কাশির মত, বিজন শুনেই বুঝতে পারল, ঠিক এই রকম কাশিই সে আজ সারাদিন কাশছে এবং কোনো সুস্থ লোক এভাবে কাশে না। লোকটার স্থির চাউনি বিজনের ভিতরে গিয়ে পড়লে সে ভীতভাবে হাসল।

একতলার বাথরুম থেকে শেফালির সাবান কে মেখে গেছে? ক্ষয়ে গেছে তার সাবান। 'ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ,' ঘৃণায় শেফালি থুতু ছিটোচ্ছে উত্তরে, দক্ষিণে, চতুর্দিকে। 'এ কী প্রবৃত্তি!' শেফালি চেঁচাচ্ছে তারস্বরে। শেফালি থুতু ছিটোচ্ছে, 'ছিঃ, ছিঃ,' বিজন রাস্তা থেকেও শুনতে পেল।

সেইদিন রাত্রে বিজন একটা স্বপ্ন দেখল। ছেলেবেলায়, মা মারা যাবার পর, ভোরবেলা বাবার সঙ্গে সে পুরী বেড়াতে গেছে। সে দেখল, উত্তাল সমুদ্র থেকে ঢেউ আসছে একটার

পর একটা, শব্দ হচ্ছে না। অধিকাংশ স্বপ্নের আকাশ যেমন থাকে, মেঘলা, সূর্যোদয়ের আগে একফালি লালকোমল আলো ছড়িয়ে পড়ছে বিস্তীর্ণ হয়ে, একটার পর একটা ঢেউএর চূড়ায় পা-রেখে পা-রেখে আলতা-পরা পায়ে কে চলে যাচ্ছে পশ্চিমের দিকে? বিজনের মার কথা মনে পড়ল।

ওদিকে দিগন্তে সূর্য উঠল লাফ দিয়ে, বনবন করে ঘুরছে, দূরে দেশলাই-কাঠির মত একটা নৌকা এখন বিন্দু হয়ে তার মধ্যে ঘুরছে সরে সরে, একটা ফেনময় ঢেউ কাছে এসে বিজনের পায়ে পড়ল। পায়ের পাতা ভিজিয়ে সরসর করে সরে যাচ্ছে জল, এ কী, বিজনের পা ডুবে গেছে একরাশ বেলফুলে, ভীষণ, ভীষণ সুড়সুড়ি লাগছে তার, বিজন ফিক্ করে হেসে ফেলল।...

বিজন দেখল, তার গলায় একটা গোড়ের মালা। মালা তো? হ্যাঁ মালা। বোধনের আগের দিন ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেছে সারারাত, বিজন লাল হাফপ্যাণ্ট ও বুক পকেটে সোডার ছিপি-আঁটা একটা সবুজ বুটি-দেওয়া শার্ট পরে পূজামণ্ডপে ঢুকল। স্বপ্নে বিজনের মনে পড়ল, তার তো ছেলেবেলার কোনো ফোটো নেই, বা-বা, ওইরকম দেখতে ছিল নাকি তাকে? স্বপ্নে যেমন হয়, বিজনের একবার মনে হল, সে কি স্বপ্ন দেখছে?

শূন্য মণ্ডপে ভারি পর্দা সরিয়ে উঁকি দিয়ে বিজন প্রতিমা দেখছে। প্রতিমার পিছনে রাত্রির একটা সিন টাঙানো, চিত্রকর যাতে চাঁদ আঁকে নি। রাত্রির ঝড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে প্রতিমার ডাকসাজ, শরীরের এখানে ওখানে মাংস-কাদা খোবলানো, কুষ্ঠরোগিনীর মত হাত দুটো গলে যাচ্ছে, একটা ভ্রূ নেই, বিজন দেখল, চোখের কোল বেয়ে তারার কালো রঙ

গড়িয়ে পড়ছে, যেন কাজল, চুলের মধ্যে দিয়ে গড়িয়ে পড়ে সিঁথির সিঁদুর লাল রক্তে ঢেকে ফেলছে মুখমণ্ডল। পিতলের প্রদীপের বুকে এখন সলতে পুড়ছে চচ্‌চড় করে। প্যাণ্টটা একহাতে টেনে তুলে বিজন তার প্রিয় জামাটার গায়ে হাত বোলাল, সোডার ছিপিটা স্পর্শ করে দেখল।...

অন্ধকার; একটা সিঁড়ি। বিজন উঠছে। গলায় দুলছে মালা। শাদারঙের মালা, বিজন ছুঁয়ে দেখল, সেই ছেলেবেলার মালা। স্বপ্নের মধ্যে সে অস্বস্তি বোধ করল। বিজন একটা লম্বা করিডোরে পা দিল। দু'দিকের উঁচু-উঁচু দেওয়ালে মুখোমুখি সার সার দরজা। দরজার সামনে আলো, যেন শাদা-কালোয় একটা সতরঞ্চি। বিজন দেখল করিডোরটা অন্ধকার, তবে মাঝে মাঝে তাকে আলোগুলিও পেরোতে হবে। বিজন দেওয়াল ধরে অগ্রসর হল। একটা জানলা খুলে মুখ বাড়িয়ে, 'রেণুর ঘরে যাচ্ছেন?' বলেই শেফালি ফটাস্ করে জানলাটা বন্ধ করে দিল। এরপর বিজন যত এগিয়ে যাচ্ছে ভয়হীন, দরজায় দরজায় মীরা, বাসন্তী, খাতুন, চামেলি, ওরা সব ভীত সরিসৃপের মত চমকানো মুখগুলি গর্তে ঢুকিয়ে নিচ্ছে লহমায়, বিজনের পিছনে আলোগুলি একে একে নিবে গেল। রেণুর ঘরের সুদূর দরজাটার সামনে পৌঁছে হাতখানেক আগে থমকে দাঁড়িয়ে বিজন পিছন ফিরে দেখল, করিডোরটা এবার ডুবে গেছে ঘন ও নিরেট অন্ধকারে। অন্ধকারে—না, বিজন নিজে দপ্ করে নিবে গেল, করিডোরটা আর নেই। তাহলে! সে ফিরবে কী করে?

রেণুর ঘরে সরকারী কর্মচারী বিজনকে দেখে হৈ-হৈ করে উঠল। শেফালি গ্লাসটা ঠক্ করে নামিয়ে রেখে বলল,

'ফাঁক !' এমন সময় বাইরে গম্ভীর ও সুরেলা গলা শোনা গেল, 'চাই বেলফুউউউউল !'

ঘড়িতে আটটা বাজল। রেণু সরকারী কর্মচারীকে ফুল কিনতে বলল। যদিও দেওয়ালের ওপাশে, বিজন ফুলওয়ালাটাকে দেখতে পেল। শুকনো মুখ, খোঁচাখোঁচা দাড়ি, হাত ভর্তি গোড়ের মালা, বেলকুঁড়ির মুকুট, রজনীগন্ধা, কয়েকটা ব্ল্যাকপ্রিন্স—আরে, এই লোকটা চৌরঙ্গিতে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে মাজন বিক্রী করে না ! বিজন বেশ অবাক হয়ে গেল। সরকারী কর্মচারী রেণুর হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে ঘুরে পড়ে গেল বিছানায়। বিজন দেখল, ওর ব্যাগ থেকে ঝুলে রয়েছে গোছা-গোছা নোট। বিজন বালিশের তলা থেকে ব্যাগটা বের করল। তখন, মাথার সুদীর্ঘ চুল একবার খুলে, তারপর তুলে, টান করে বাঁধতে বাঁধতে রেণু চিৎকার করে উঠল, 'সাবধান ! দাঁড়াও—এই দেখ—' দু'হাতে বুকে এমন চাপড় মারতে লাগল রেণু যে, বিজনের মনে হল, সে বুঝি তার বুক দু'ফাঁক করে ফেড়ে ফেলে তাকে কিছু দেখাতে চায়। তার বদলে, রেণু পটপট করে ব্লাউজের সবক'টা বোতাম খুলে ফেলল। আঁতকে উঠে বিজন দেখল, রেণুর বুকে কাকাতুয়ার নোখের মত কর্কশ, বাঁকা ও ভয়ংকর কয়েক গাছি চুল ! রেণু রাক্ষসীর মত ওষ্ঠহীন হাসল।

স্বপ্নের ভয় জাগরণের চেয়ে অনেক বেশি। মনিব্যাগটা কোথায়, ডান পকেটে, বাঁ-পকেটে ? দু'হাতে বুক চেপে ধরে আতঙ্কের বর্ণনার মত বিজন রাস্তা দিয়ে ছুটতে লাগল।...

অফিসের ছুটি হয়ে গেছে। রামাধার সেলাম করল। দু'তিনটে ফাঁকা হল পেরিয়ে বিজন ঢুকল বড়বাবুর ঘরে। বড়বাবু নিঃশব্দে তার হাতে ভারি ও মোটা পার্সোনাল ফাইলটা

তুলে দিলেন। বিজন ওল্টাতে ওল্টাতে দেখল তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ফাইলে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এটা এবার জি. এম-এর কাছে সই হবার জন্য যাবে। এতদিন চাকরি করছে, জি. এম-কে বিজন কোনদিন দেখে নি। স্বপ্নেও সে তাঁকে দেখতে পেল না।

অফিসে এতদিন ধরে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছে, অথচ সে তা জানতে পারে নি! শুঁড়-বের-করা দুটো মুখোমুখি পিঁপড়ে যেমন করে পরস্পর কথাবার্তা বলে, পি. এ. ও বিজনের মধ্যে সেইরকম কথাবার্তা হতে লাগল। বিজন বলল, 'আমাকে সাবধান করে দেন নি আপনি!'

বিজন দেখল, বাঁ-দিকে মার্জিনে লেখা, 'পি. এ. টু জি. এম. থ্রপ্রপার চ্যানেল' ও কয়েক পৃষ্ঠা পরপর ওপরে লালকালিতে লেখা হেডিং, নিচে বিবরণ :—

পৃ ৪১	আইটেম নং ২০	সিসিল বারে একাকী মদ্যপান ও তার বিস্তৃত বিবরণ	তাং	"	"	".
পৃ১১০	"	" ৫২ ঐ	"	"	"	".
পৃ ৫৬	"	" ২৭ ডাক্তারখানা থেকে পলায়ন : বন্ধু হিরণ্ময়ের অসুখের জন্য ইনজেকশন নিতে অসম্মতি	"	"	"	"..
পৃ ৮১	"	" ৩৯ ১৯. ৬. ৫৮. থেকে ১৯. ৬. ৫৯ পর্যন্ত ২৭৫০ ফাইল গ্রহণ ও ২৫০টি প্রত্যর্পণ	"	"	"	".
পৃ১৮৯	"	" ৮৯ বাবা ও আরো ২০ জন লোকের মুখ ম্লান করে দেওয়া	"	"	"	".
পৃ১৪৯	"	" ৭২ বৌদির সঙ্গে অবৈধ ও গোপন প্রণয়	"	"	"	"...
পৃ১৭৩	"	" ৮৩ সিসিল বারে একাকী মদ্যপান	"	"	"	"..

এইখানে পি. এ. বললেন, '২০০ পৃষ্ঠা দেখুন।' পাতা উল্টে বিজন দেখল, পাতা জুড়ে লালকালির হেডিং : আইটেম নং ৯২ সোনাগাছিতে রেণুর গৃহে রাত্রিযাপন তাং ২রা সেপ্টেম্বর···। বিজনের দম বন্ধ হয়ে এল, সে বিস্তৃত বিবরণ পড়তে লাগল।

ঘর স্তব্ধ হয়ে থাকে। অনেকক্ষণ পরপর তার হৃদপিণ্ডে শব্দ হয়। ঘরে অন্য কোনো শব্দ নেই, ঘরের চারপাশে আহত কুকুরের মত রাত্রি ঘুরছে প্রভুভক্ত, গোল ঘড়িটা সময়ের এ-ঘরে ও-ঘরে হাত রাখছে ঠিক ঠিক, মাথার ওপর দড়িতে বাঁধা ব্যাঙের মত পাখাটা ঝুলছে হাত-পা ছড়িয়ে। পড়তে পড়তে দম আটকে গেল বিজনের, বুক ফেটে যাবার উপক্রম হচ্ছে, বিজন আইটেম নং ৯২ পড়ে শেষ করল। 'নাঃ, সে কথা নেই, সে কথা কেউ জানে না···' এই বলে, বুক খালি করে এত-জোরে নিঃশ্বাস ফেলল সে, যে ফাইলের অনেকগুলি পাতা উড়ে গেল ফরফর করে। বিজন দেখল :

পৃ ১ আইটেম নং ১ লাল পিঁপড়ের গর্তে খোঁচা দিয়ে, তার মধ্যে একটি জীবন্ত কেঁচো নিক্ষেপ ও তার বিস্তৃত বিবরণ তাং ১৯।৬।৩৯

বিজন মূক হয়ে গেল। বিজন এইবার টের পেল কী ভয়াবহ ও ব্যাপক এদের অনুসন্ধান! সে বলতে চাইল, 'এ তো আমার ছেলেবেলার ঘটনা। এ আপনারা জানলেন কী করে?' কিন্তু বলার আগে বিজন আবার ভয় পেল, স্বপ্নের সেই ভয়, জাগরণের চেয়ে যা অনেক বেশি। বিজন দেখল, পি. এ. টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়েছেন। টেবিলে নীলসাপ লতা ও পদ্ম আঁকা রেণুর ঘরের সেই ফুলদানীটা, তাতে সু দী র্ঘ

রজনীগন্ধা, আর তার ঠিক পাশে, দেখে হাত-পা পেটের ভেতর ঢুকে যাবার উপক্রম হল বিজনের, মুখ থেকে খুলে-রাখা পি. এ-র দু'পাটি দাঁত, তার লাললাল মাড়ি সুদ্দু! পোড়া রাবারের গন্ধ ছাড়ছে তা থেকে।...

বিজন আবার প্রাণভয়ে ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে ফের সেই সমুদ্রের ধারে এসে হাজির হল। বিজন দেখল, অদ্ভুত অবস্থা। রাস্তা পর্যন্ত জল উঠে এসেছে, সমুদ্রের ওপারে প্রবাস থেকে হাওয়া আসছে হা হা, হোটেলের দরজা-জানালা-গুলি বন্ধ, অদূরে হাড়-পাঁজরের মত একটা নারকেল পাতা টাঙানো। ওদিকে বিদ্যুৎ চমকাল। বিজন জানতে পারল, কে যেন বলেই গেল তাকে, 'আজ সাইক্লোনের আবহাওয়া!' ফ্ল্যাগস্টাফের কাছে একটা খুঁটি পোঁতা দেখল, তাতে লেখা :

বিপদ!

অদ্য কেহ সমুদ্রে স্নান করিবেন না।

জনহীন মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা দিয়ে গোড়ালি অবধি জলস্রোত ভেঙে ছপছপ শব্দ তুলে বিজন পূর্বদিকে হাঁটতে লাগল। কী বিপুল এই অন্ধকার, এ-রকম ছায়াবিহীন অন্ধকার বিজন আগে কখনো দেখে নি। অথচ একটা আভাও রয়েছে তার, কারণ বিজন পথঘাট সবই দেখতে পাচ্ছে। একটু আগে মিউনিসিপ্যালিটির নোটিশও সে পড়তে পেরেছিল।

উড়ন্ত জলকণায় ভর্তি হাওয়া চালাচ্ছে উল্টোদিক থেকে, বিজন অন্ধকারের স্রোত ঠেলে এগিয়ে যেতে লাগল। এক জায়গায়, যেমন মঞ্চের মাঝখানে, ঘুরিয়ে-ফেলা গোল আলো, সেখানে একটা জেটি। জেটির ওপর দাঁড়িয়েও, জেটি কোথা

থেকে এল, বিজন বুঝতে পারল না। সমুদ্রে জেটি থাকে কি? ওপর থেকে সে দেখল, অনেক নিচে একটা বালির পাহাড়, ছোট একটা বীচ রয়েছে সেখানে। অনেকক্ষণ পরপর ঢেউ আসছে, দূরে একটা উঠল ফার্স্ট ব্রেকারের কাছে, উঁচু গড়ানো বালুস্তূপের ওপর থেকে বিজন তরতর করে নেমে গেল, ছুটতে ছুটতে হাঁফাতে হাঁফাতে যখন সে সমুদ্রের ধারে পৌঁছুল—শেষ ব্রেকারটিও তখন ভেঙে পড়েছে। সমুদ্র তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সরে গেল।

ভিজে বালি উঠছে চকচকিয়ে, পায়ের পাতা তখনও সরসর করছে, ফসফরাসগুলো জ্বলছে, নিবছে। জল সরে যাবার পর বিজন দেখল, পায়ের কাছে কয়েকটি লাল পাপড়ি পড়ে রয়েছে। বিজন উঁচুতে রাস্তার দিকে তাকাল। শ্মশানটা দেখা যাচ্ছে না, কোনো মৃতদাহের আলো নেই, কিন্তু দেবদারুগাছটার চেহারা দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট, একঝাঁক জোনাকি চক্রের মত ঘুরছে তাকে ঘিরে, তাতে আরো ভয়ংকর দেখাচ্ছে—যেন ভীষণদর্শন একটা ডোম দাঁড়িয়ে আছে শ্মশানে।

বিজন গলায় হাত দিল। মালা, হ্যাঁ মালা-ই তো। সে হেঁট হয়ে পাপড়ি ক'টি কুড়োতে গেল। লাল কালো হয়ে গেলে যেমন, তেমনি রঙ পাপড়িগুলির। এ যে খুবই চেনা ফুলের পাপড়ি, ব্ল্যাকপ্রিন্স, বিজনের মনে পড়ে গেল, খুব হত তার মায়ের হাতে, প্রায় কনুই-অব্দি সোনার চুড়ি-ভর্তি, শাঁখার মত শাদা, ভারি মিষ্টি গোলাপ ফোটাবার হাত ছিল তার মায়ের।

পাপড়িগুলি হাতে নিয়ে বিজন চোখ বুজল। চোখ বুজতেই এ কী হল তার! পায়ের নিচে বিপুল একটা অন্তঃস্রোতের টান অনুভব করল বিজন, অমাবস্যার ছায়াবিহীন অন্ধকার

অতর্কিতে তার ছদ্মবেশ খুলে দাঁড়াল একটা গোটা সমুদ্রের চেহারা নিয়ে, ওপরে শ্মশানে দেবদারুগাছের গলায় জোনাকির মালা দুলছে মুহুর্মুহু, চূর্ণ হবার মুহূর্তটা নিয়ে ফেঁপে উঠল যে বিশাল ঢেউ, বিজনের চাউনিসুদ্দু সাড়হীন দেহটা তার ভিতর চিৎ হয়ে ঢুকে যেতে যেতে দেখল যে, তা থেকে ছিটকে পড়ছে লম্বা লম্বা বেঁকে-যাওয়া ফেণা, বিদ্যুচ্চমকের শেষ চৈতন্যটুকু দিয়ে বিজন দেখল ঢেউ-এর গায়ে ডোরা কাটা দাগ, তার কষে ফেণা। সম্পূর্ণ নেবার আগে সকলকেই যেমন দেখায়, সমুদ্র বিজনকেও তার সেই বিশাল থাবার লম্বা ও বেঁকে-যাওয়া ক্ষমাহীন নোখগুলি একবার দেখাল ও লুকিয়ে ফেলল।

আগে থেকে এ-গেজমেণ্ট করা ছিল, পরদিন বিজন একজন স্পেশালিস্টের কাছে গেল। স্পেশালিস্ট প্রায় আধঘণ্টা ধরে পরীক্ষা করে, সাঁড়াশির মত স্টেথিশকোপটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বললেন যে, বিজনের খুব গুরুতর অসুখ হয়েছে। তবে চিকিৎসা করালে সেরে যেতে পারে। আজ-কাল সেরে যায়।

দশ বছর পরে একদিন

একদিন দুলাল দত্তর সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে দেখা। বলল, 'আমায় চিনতে পারছিস? আমি দুলু।'

দুলাল! বিজনের মনে পড়ল। স্কুলে ছাড়াছাড়ি হবার পর তারা যখন আলাদা কলেজে পড়ত, তখনও মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে। সে বহু বছর আগের কথা।

'তুই না এলাহাবাদে চাকরি পেয়েছিলি?' বিজন জিজ্ঞাসা করল।

'বদলি হয়েছি কলকাতায়। তুই সেই কালিদাস পতিতুণ্ডিতেই তো?'

'মনে আছে তোর?' বিজন বলল, 'ক' নম্বর বল দিকিনি?'

নাম্বার বলে দুলাল হাসল। বলল, 'চলি রে। ট্রেন ধরতে হবে।'

'চল না।' হাঁটতে শুরু করে বিজন বলল, 'যাবি কোথা?'

'শ্বশুরবাড়ি।' দুলাল তখন থেকেই হাসি রেখে দিয়েছে মুখে, 'তোর ছেলে-পিলে ক'টা?'

'একটাও না।'

'সে কী রে! কদ্দিন বিয়ে করেছিস?'

'করি নি।'

'সে কী রে!'

বিজন হাসল, 'তোর?'

'এই দুটো-তিনটে আর কি!' দু'-জনের হাসির মাঝখানে দুলাল বলল, 'আয় না একদিন আমাদের বাসায়। সামনের শনিবার তো ছুটি আছে, আসবি বিকেলের দিকে? বউকে আনতে যাচ্ছি, ওকেও দেখবি সেই দিন।'

ট্রেনে উঠে দুলাল ঠিকানা দিল। ট্রেন ছেড়ে দিলে বিজন চেঁচিয়ে বলল, 'ঠিক যাব। তুই ভাল করে গুনে আসিস ক'টা।'

শনিবার দিন দোলের জন্যে ছুটি ছিল, বিকেলে রাস্তায় বেরিয়ে দেখল ধুলো উড়ছে রঙীন, বিজনের বেশ ভাল লাগল। বাসে-ট্রামে অসম্ভব ভিড়, একটার পর একটা রাস্তা পেরিয়ে, ঠিকানা খুঁজে, সন্ধ্যে-নাগাদ সে সত্যিই দুলালের বাসায় গিয়ে হাজির হল। হলিডে-অন-আইস ফ্রক-পরা একটি ছোট মেয়ে দরজা খুলেই জিজ্ঞাসা করল, 'বাবাকে খুঁজছেন, না দাদুকে? আসবার সময় একটা পার্ক দেখেছেন? দাদু ওই পার্কে বেড়াতে গেছে।'

ঠোঁট উল্টে বিজন বলল, 'তবে আর কী করা যাবে! বাবাকেই না হয় ডাক?' বলতে বলতেই ভিতর থেকে চেঁচিয়ে উঠল দুলাল, 'কে বিজন! এসেছিস,' হাত ধরে ঘরের ভিতর টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল, 'আয় আয়', একটা ফোল্ডিং-চেয়ার ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'খুলে বোস', বলেই দ্রুত চলে গেল অন্দরমহলে। বরাবরই খুব ফুর্তিবাজ ছেলে দুলাল, ফিরে এল ম্লান মুখে, হাত উল্টে বলল, 'মা-র সামনে কোলে করে আনতে পারলাম না ভাই। ম্যাডাম একেবারে চা-টা নিয়ে আসছেন। চল ভেতরে চল।'

দুলালের শোবার ঘরে খাটের ওপর বসে দুই যুবক বন্ধুতে মিলে বিগত যৌবনের গল্প করতে লাগল। গল্প-গুজবে কিছুক্ষণ কাটার পর, দুলাল জিজ্ঞাসা করল, 'কে কোথায় থাকে বল তো? মাসদুই এসেছি, তোর সঙ্গেই প্রথম দেখা।'

অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিল বিজন, সে বলল, 'বলছি,' জিজ্ঞাসা করল, 'ওটা কী ফুল রে? কাগজের নয় তো?'

'না-না রিয়্যাল।' তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করল দুলাল, 'শিমুল ফুল, আমার শ্বশুরবাড়ির। ওর জন্মদিনে নাকি পোঁতা হয়েছিল গাছটা। এই সময় প্রত্যেকবার আনে।'

'বাঃ, জন্মদিনের গাছ? বেশ টাটকা আছে তো ফুলগুলো!' আচমকা জিজ্ঞাসা করল বিজন, 'তোর বউ ভীষণ সুন্দরী নয় তো রে, দেখিস বাবা।'

একটু পরে দুলালের বউ এল। পিছনে ঝি এর হাতে খাবার আর চায়ের সরঞ্জাম। পর্দা সরিয়েই হাত দুটো জড় করল বুকের মাঝখানে।

'মে আই ইনট্রোডিউস?' উঠে দাঁড়িয়ে বাঁ-হাতটা দরজার দিকে প্রসারিত করে দিল দুলাল; পরে, যেন গোপন খবর, বলল, 'মনিমালা।'

স্মৃতি বড় কম নয়। স্মৃতির চেয়ে বড় এক আকাশ।

দুই বন্ধুতে গল্প-গুজব করতে করতে রাত কাবার হয়ে যাবার কথা, কিন্তু আধঘণ্টার মধ্যেই বিজন উঠে পড়ল। মনিমালা বলল, 'সে কি!' বিজন বলল, 'শিগ্‌গির আসব একদিন। আমাদের বাড়িতেও আসবেন। দুলালের মুখস্থ আছে ঠিকানা।'

রাস্তায় বেরিয়ে দুই বন্ধুতে হাঁটতে লাগল। এই গলিটা প্রায় ফাঁকা, লোক-জন নেই বললেই চলে। যেন একটু বেশি দূরে দূরে গ্যাসের আলো, পথ চকচকে, শুধু সাইনবোর্ডটুকুকে আলোকিত করে মাঝে মাঝে ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বলছে। এখন বসন্তকাল, হাওয়া চালাচ্ছে বেশ, চিক্কন পথের উপর দিয়ে খরখর করে উড়ে যাচ্ছে শালপাতার ঠোঙা, মোড়ে গ্যাসের আলোর নিচে একটা রিকশা। আরো দূরে ট্রামের তারে আওয়াজ, ঘণ্টার শব্দ।

না-দেখেই অনুমান করে নেওয়া যায় তবু, যে তারা দুই বন্ধু, বাসন্তী রঙ, ম্যাজিক রঙ, বাঁদুরে রঙ কি খুনখারাবি, অন্ধকারে এই সব নানারঙের রাস্তা মাড়িয়ে হাঁটছে।

বিজন জিজ্ঞাসা করল, 'তোর কোথায় বিয়ে হয়েছে রে?'

'উত্তরপাড়ায়। কেন বলি নি তোকে সে-দিন?'

'না।' শান্ত গলায় বিজন বলল। আজ বেচুর কথা তার খুব মনে পড়ছে। বেচু এই রকম শান্ত স্বরে কথা বলে। সে কি বেচুকে অনুকরণ করল?

কেউ হাঁটা থামাল না। হাঁটতে হাঁটতে তারা একটা ব্যস্ত রাস্তায় এসে পড়ল। এখানে কোলাহল, আলোয় আলো, সকলেই ব্যস্ত ভাবে হাঁটাহাঁটি করছে। বাস চলে যাচ্ছে লোকবোঝাই, ট্রাম চলে যাচ্ছে দ্রুত, ছড়-তুলে-নেওয়া এস্রাজের তারের মত চকচকিয়ে উঠছে ট্রামলাইন, লাইনের ধারে পোড়া ঘাসের কাছে ঘাস থরথর করে কাঁপছে। গলির মুখে একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে সবুজ আলোর জন্যে, তার হেডলাইটের তীব্র আলো গিয়ে পড়েছে ওই ফুটপাথের চুণকাম-করা দেওয়ালে, পানের পিচের মত টকটকে এক পোঁচড়া রঙের

ওপর। স্টপে দাঁড়িয়ে সেই দিকে চেয়ে বেচুর মত অবিকল বিষাদময় গলায় বিজন জিজ্ঞাসা করল, 'তোর ঘরে একটা সেতার দেখলাম, কে বাজায় রে?'

'বাজায় আর কে। বল বাজাত। বউই বাজাত। সেই ছেলেবেলা থেকে চর্চা, শুনেছি ভাল নাচতেও পারত, দেখ না, একদিন ছেড়ে দিল হুট করে। এখন আর ছোঁয় না। ছোঁবে কী করে,' দুলাল বলল, 'যা ধুলো।'

'হয়ত ভুলেই গেছে।' একটু থেমে দুলাল আবার বলল, 'তুই রবিশঙ্করের সেতার ভালবাসতিস খুব। এখনো শুনিস রাত জেগে?'

বছরপাঁচেক আগে একদিন রবিবার বিকেলে বিজন মেয়েটিকে দেখতে গিয়েছিল। ছোড়দি তখনো বেঁচে ছিল, জামাইবাবুকে নিয়ে ছোড়দি আসবে স্টেশনে, সাড়ে-তিনটের সময় ঘড়ির নিচেই অপেক্ষা করবে। দু'-তিন দিন আগেই বিজন বন্ধুদের বলে দিয়েছিল যে, সেদিন আড্ডায় সে হয়ত অনুপস্থিত থাকবে, বা তার দেরি হবে।

সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, দুপুরবেলা তাকে ডেকে তোলা হল। ঘুম ভাঙতে প্রথমেই সে শুনল বউদি তাকে ডাকছে। 'এই বিজন—' বউদি ডাকছে, 'ঠাকুরপো?' পরমুহূর্তে বৃষ্টির ছরছর শব্দে বউদির ডাক আর শোনা গেল না, মন দিয়ে বৃষ্টির শব্দ শুনবে বলে সে তাড়াতাড়ি বলল, 'যাচ্ছি,' তখুনি তার মনে পড়ল কেন তাকে ডাকা হচ্ছে; তারপরেই আবার বৃষ্টির শব্দ শুনতে গিয়ে সে সবই ভুলে গেল।

বেশ কিছু মুহূর্ত আরো কেটে গেলে সে ট্রামের শব্দ পেল। তখন আস্তে আস্তে চোখ না খুলেই সে বুঝতে পারল, না, বৃষ্টি না, এ হল চারতলা থেকে ট্যাঙ্কের জল উপচে পড়ার শব্দ। মনে হতে খুবই দমে গেল সে। এইজন্যই পরিপূর্ণ ঘুম থেকে জেগে-ওঠা রবিবার সন্ধ্যাবেলার আড্ডায় একদিনও সে প্রাণ খুলে হাসতে পারল না। বৃষ্টির শব্দে ঘুম ভেঙে-যাওয়া, কি ঘুম ভাঙতে-ভাঙতে বৃষ্টির শব্দ শোনা, বা, এই যেমন আজ, দাদা কি বউদির ডাকে ঘুম থেকে জেগে উঠেই বৃষ্টির শব্দ, এটা কত প্রীতিকর! কিন্তু, কী হতভাগ্য সে, এ-বাড়িতে উঠে আসার পর আজ তিন বছর হতে চলল প্রায়, প্রতি রবিবার ঘুম থেকে উঠেই তার এই আশাভঙ্গ, দিনের পর দিন স্নায়ুর উপর এই উৎপাড়নের জন্যই হয়ত সে এমন নির্জীব হয়ে পড়েছে! বিজন আজো হতাশ হল, সন্ধ্যাবেলার ডিপ্রেশন আজ বিকেলের আগেই তাকে ছেঁকে ধরল।

যা হোক বাথরুমে গিয়ে মুখ ধুয়ে এসে সে দাড়ি কামাতে বসল। বউদি এসে একবার তাড়া দিয়ে গেল, 'কী গো, যাবে কখন, তাড়াতাড়ি করো।'

বিজন বলল, 'আচ্ছা বউদি, চিঠির একটা উত্তর না পেয়ে, হুট করে চলে-যাওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে?'

বউদি বলল, 'ওমা, উত্তর আবার দেবে কি!'

তা সত্যি। মেজদা চিঠি দিয়েছে বেস্পতিবার। সময় কই উত্তর দেবার?

'ইশ্।' ঠোঁটের নিচে একটু কেটে গিয়েছিল, আঙুল দিয়ে সেখানে অল্প ফেণা লাগিয়ে দিল বিজন, 'সময় রেখে চিঠি দেওয়া উচিত ছিল।'

বিজনের কণ্ঠস্বরে বরাবরই ক্লান্তি ও বিষণ্ণতা থাকে, শেষ কথাটিতে কি অস্বাভাবিক কিছু বেশি ছিল? বিজন পেরেকে-টাঙানো আয়নাটার দিকে তাকিয়ে ছিল, এখন গলাটা কামাচ্ছে; তার ভ্রূ, সরু দাড়ি, চোখের কোলে কালি, এ-সব কিছুই দেখা যায় না। বউদি তার গাঁট-ওঠা উন্মুক্ত মেরুদণ্ডটার দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত কী খুঁজল, তারপর বলল, 'তোমার দাদাকে সঙ্গে যেতে বলব?'

'বলো না। আবার যাবে কি?' বিজন বলল। মুখ ফিরিয়ে বউদির চোখের দিকে ক্লান্ত দৃষ্টিতে সে চাইল, 'তা হলে তো ভালই হয়—' নইলে, ছোড়দির হাত ধরে, যদিই জামাই-বাবু না আসেন, কোনো বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কড়া নেড়ে তারপর সে কী করে আত্মপরিচয় দেবে, বর্ণনা করবে তার উদ্দেশ্য, বলবে, আমি মেয়ে দেখতে এসেছি?

অন্য কোনোভাবে কাটাবার উপায় নেই, চিরকাল পিসতুতো দাদার বাড়িতে থাকা চলবে না, অফিস থেকে বেরিয়ে সে তবে যাবে কোথায়, ভবিষ্যতের কোনো-একদিন? সেদিন যখন তার আটত্রিশ বছর বয়স, কি চল্লিশ, সেদিন তখন সে তো শুধুই নিঃসঙ্গ নয়! কারণ নিঃসঙ্গের মধ্যেও একটা রক্তক্ষরণ থাকে, সে ভেবে দেখেছে, স্মৃতির প্রতি, অতীত সঙ্গের জন্য বেদনা থাকে। দশ বছর পরে সে-দিন অফিসের বাইরে জনতার স্রোতের ধারে দাঁড়িয়ে যখন তার নিজেকে অবয়বহীন মনে হবে, অবয়বহীন শূন্য মনে হবে, সে তখন যাবে কোথায়? কেউই হাঁটা থামাবে না, সব চেয়ে বিহ্বলতার কথা এই, 'আমার কোথাও যাবার নেই কাজেই আমি কেন হাঁটব,' সেদিনও একথা উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ থাকবে। বিয়ে করে কিছুই হবে

না, কিন্তু সেদিন একটা বাসা-বাড়ির দিকে, যেখানে স্ত্রী-পুত্র আছে, সেইদিকে হেঁটে-যাওয়া ছাড়া তার উপায় নেই।

ঐ জন্যই বিজন তার বিয়ের জন্য চেষ্টাকে বাধা দেয় নি, ন্যাকামি করাকে ঘৃণা করে বলে নয়, ঘৃণা তো করেই। তবে এও ঠিক যে মেয়ে দেখতে যাবার ইচ্ছে তার ছিল না। তাকে ফোটো দেখানো হয়েছিল, অতটা কল্পনাশক্তি তার নেই, ফোটো থেকে জীবন্ত একটি মেয়ে-সম্পর্কে কোনোরূপ ধারণা সে করতে পারে নি, বিজন সে-জন্যও মেয়েটিকে দেখে নিতে ইচ্ছুক হয় নি। আসলে মেয়েটি সুশ্রী না হলেও সে তাকে বিয়ে করবে, সুন্দরী হলেও করবে। মেয়েটির শুধু এইটুকু যোগ্যতা থাকা দরকার যে, তারা যখন প্রয়োজনবোধে রাস্তা দিয়ে পাশা-পাশি হাঁটবে, লোকে যেন চেয়ে না দেখে, তারা যেন চোখে না পড়ে, ভিড়ে মিশে থাকার যোগ্য হয়। আসলে, মেয়েটি ও তার পারিবারিক লোক-জনদের সামনে বিজন নিজেকে একবার দেখাতে চেয়েছিল।

সে নাও যেতে পারত। দাদা-বউদির মেয়ে পছন্দ হয়েছিল, ছোড়দি আর জামাইবাবু দেখে এলেই দিন ঠিক করে ফেলার ইচ্ছে ভদ্রলোকের ছিল। কিন্তু দিন-দুই পরে বউদি হঠাৎ বলতেই বিজন রাজি হয়ে গেল। কারণ ব্যাপারটা নিয়ে তার ভাবা ছিল। তার নিজেকে উপস্থিত করা দরকার, মেয়েটি বা তার পারিবারিক লোক-জন যদি তার ত্রুটিগুলি ধরতে না পারে, তবে সে দোষ তার নয়।

ভাগ্যিস মেজদা সঙ্গে এসেছিল, জামাইবাবু মাছ ধরতে গেছেন, চিঠি পাবার আগে থেকে প্রোগ্রাম ছিল। ছোড়দি একটু দেরিতে এল। ছোড়দি সেই জবরজঙ মুর্শিদাবাদীটা পরে নি,

গলায় একগাছি সরু চেন ছাড়া কিছু নেই, ভাগ্যিস সেই সস্তা আর কুচ্ছিত হ্যাণ্ডব্যাগটা ছোড়দির কব্জি থেকে ঝুলছে না।

'কী ভাই, তুমি এমন আধময়লা শার্ট পরেছ কেন? একটু স্নো না হয় মাখতে একদিন?' সহাস্যে মুখ তুলে ছোড়দি তার দিকে চাইল। ভাবখানা, 'দেখ তো চেয়ে আমারে এবার চিনিতে পার কি না' গোছের। বিজন হেসে ফেলল।

স্টেশনের চত্বরটা পেরোতে পেরোতে দিদির বয়সী কয়েকটি ভদ্র-মহিলাকে সে ভাল করে দেখল। না, অন্তত এই ক'জনের প্রত্যেকের চেয়ে তার দিদিকে দেখতে ভাল। এমন একজন সুন্দরী দিদির পাশে বসলে মেয়েটি ও তার পারিবারিক লোক-জনের সামনে তার ত্রুটিগুলি অনেকটা ঢেকে থাকবে, এই দুর্বলতাকে টের না পেয়ে বিজন প্রশ্রয় দিয়ে বসল।

'মেয়ের আবার তোকে পছন্দ হলে হয়?' ট্রেনের দিকে যেতে যেতে দিদি বলল। চমকে উঠে, পরমুহূর্তে দিদির সহজ মুখ দেখে বিজন হেসে ফেলল।

সাইকেল-রিকশা থেকে নেমে বাড়িটার দিকে তাকিয়েই বিজনের ভাল লাগল। সন্ধ্যাবেলা নাকি মেয়ে দেখা ঠিক নয়, সূর্য-ডোবার পরে যে আলো হয় তাতে মেয়েদের বড় কাম্য বলে মনে হয়, তাই তারা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছিল। বিকেল শুরু হয়ে গেলেও এখনো রোদ্দুরের ঝাঁঝ যায় নি। একটু পরে আজ-কাল সুন্দর হাওয়া দেয়।

গ্র্যাণ্ড ট্যাঙ্ক রোডের ধারেই একতলা ছোট বাড়ি, পাঁচিলের কাচ-বসানো নিরাপত্তাকে হাস্নুহানার ঝাড় আংশিকভাবে ঢেকে রেখেছে। একটা ছোট বাগান পেরিয়ে ওরা সদর ঘরে বসল।

আগে থেকে যেমন ভেবে রেখেছিল, বিজন দেখল, এক কোণে দেওয়াল ঘেঁসে একটা চেয়ারও রয়েছে। তবে আশানুরূপ বেতের মোড়া চেয়ার নয়, সে তাড়াতাড়ি সেটাতে বসে পড়ল। মেয়েটি যদি ও-দিকটায় বসে, এটাই হবে দূরতম জায়গা।

ভিতরে খবর দিয়ে ভদ্রলোক ঘরে এসে বসলেন। রাজনীতি, আবহাওয়া, বিজন-সম্পর্কে আরো কিছু খবর ইত্যাদির মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর নীরবতাগুলির হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে ভদ্রলোক, দাদা ও বিজন তিনজনে তিনখণ্ড খবরের কাগজ আগে থেকে সংগ্রহ করে রেখেছিল। কাজেই অসুবিধা হচ্ছিল না। একটি বছর-বারোর মেয়ে এসে ঘুরেফিরে দেখে গেল, তারপর চা নিয়ে এল। দাদার সঙ্গে ভদ্রলোকের কথাবার্তার ফাঁকে কী করে বিজন, ভাবুক চোখে সে ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে চোখ বোলাতে লাগল। টেবিলের ওপর ফুলদানীতে কাগজের ফুল। পশ্চিমের লালধুলোওড়া রশ্মি এসে স্পর্শ করছে ফুলগুলি, খরখর আওয়াজ উঠছে তা থেকে। শুনে সিমেন্টের মেঝেতে খোলামকুচি ঘসলে যেমন হয়, গা কিশ্‌কিশ করে উঠল তার। তখুনি প্রকৃত ফুলের কথা বিজনের মনে পড়ল। তারপর তার ভাল লাগল। এও মন্দ কী, সে ভাবল যে, ট্যাঙ্কের জলের ছরছর শব্দ শুনে ঘুম ভাঙলেও প্রতি রবিবার জেগে উঠে প্রথমেই তার বৃষ্টির কথা মনে পড়ে। সহ্যের অতীত পীড়নের মধ্যে দিয়ে অদ্ভুত উল্টোপদ্ধতিতে মনে পড়ে, কিন্তু মনে তো পড়ে।

শেষাবধি বিরক্ত হয়ে উঠল বিজন, সে ভাবল, সে কি একটা পোকা না কি যে, জুতো, আলনা, গ্রুপ-ফোটো, ক্যালেণ্ডার, টেবিল, ছবি, ফুলদানীতে কাগজের ফুল ; ছবি, টেবিল, আল-

মারি, ক্যালেণ্ডার, ফুলদানীতে কাগজের ফুল; গ্রুপ-ফোটো, আলনা, জুতো, গঁদের শিশি, ফুলদানীতে কাগজের ফুল—বারংবার এই সব দেখছে, দেখে তার কিছুই মনে হচ্ছে না, দেখে দেখে ক্লান্ত হচ্ছে না তার চোখ!

এই সময় বাবার সঙ্গে মেয়েটি ঘরে ঢুকল এবং সে চেয়ারে বসার আগেই তাকে যা দেখার দেখে নিল বিজন। অর্থাৎ কিছুই দেখল না, কারণ দেখে তার কিছুই মনে হল না। আজ যদি তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কী দেখেছিলে, কী-রঙের শাড়ি পরেছিল সে, তার কানে ফুল ছিল, না দুল ছিল, সে এ-সম্পর্কে কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারবে না। কারণ, তার সতর্কতা ছিল মেয়েটির সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় হওয়ার বিরুদ্ধে; সে তার দেখাটুকু দেখতে গেছে, দৃষ্টিবিনিময় করতে যায় নি। তার ত্রুটিগুলি যেন কারুর চোখে ধরা না পড়ে, এই তো ছিল তার উদ্দেশ্য?

মেয়েটি কি তাকে দেখেছে? (পরে শুনেছে, মেয়েটি আড়চোখে বার বার তাকে দেখেছিল।) পাঞ্জাবির হাতা গুটনো, বেশ রোগা হাত দুটো এতক্ষণে নিশ্চয়ই ওর চোখে পড়েছে। দেখুক, তাতে তার কিছু এসে যায় না। ও তো দেখবেই, না দেখে বিয়ে করার অতবড় ঝুঁকি ও মেয়ে হয়ে নেবে কী করে? আর বিজনের যত রিস্ক দেখলে, অর্থাৎ দেখতে গিয়ে চোখাচোখি হয়ে গেলে।

সেই যে নিমেষে দেখে নিয়ে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল বিজন, দ্বিতীয়বার মুখ ফেরাল না। বাইরে তাকাতেই তার চোখে পড়ল পুষ্পপত্রহীন একটি গাছ ও তার ডালপালা। দেখে সে মনে মনে শোনাল, 'আরে এতক্ষণ দেখ নি!' তারপর বিস্তৃত গঙ্গা, সায়াহ্নের খোলা আলোয় রাশি রাশি ধোঁয়ার

কুণ্ডলীর মধ্যে প্রায়-অদৃশ্য একটা অতিকায় স্টীমার গঙ্গার সমস্ত বুক মুচড়ে ভয়াবহ বাঁক নিচ্ছে ; দেখে বিজনের মনে হল, সন্ধ্যার সময় এলেই ভাল হত। ওপারের বরাহনগর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, দেখে তার মনে হল, অতদূর পর্যন্ত যখন দেখা যাচ্ছে, সে নিশ্চয়ই এখন মানুষের চোখে দেখছে। সে তার অনুভবকে ভাল লাগার কাছাকাছি পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে গেল, তাই তার মনে পড়ল, তখন বকুলদের বাসা ছিল ওই-পারের বরাহনগর ছাড়িয়ে ডানলপ-ব্রিজের কাছাকাছি। রিণার বিয়ে হয়েছে ভবানীপুরে। দু'-দু'বার, বিজনের মনে পড়ল, সে প্রাণপণ চেষ্টায় ভালবাসার কাছাকাছি পর্যন্ত নিজেকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল।

'কীরে, তুই কিছু জিজ্ঞাসা করবি ?'

ইতিমধ্যে ঘরে যা যা কথা হয়েছে বিজন সবই শুনেছে। দিদি যখন মেয়েটিকে দাঁড়াতে বলে, ও অনুমান, পাশে দাঁড়িয়ে তার দৈঘ পরীক্ষা করল, এমন কি তখনও বিজন মুখ ফেরায় নি। কিন্তু এই সামান্য প্রশ্নে সে এমন চমকে উঠল কেন ?

মুখ ফেরাতেই মেয়েটির সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেল ! তৎক্ষণাৎ ভীতুর মতো চোখ সরিয়ে নিয়ে মেয়েটির মুখের অন্য এক জায়গায় সে দৃষ্টি স্থাপন করল, চেয়ে রইল। কেউই আশা করে নি বিজন এমন স্বরে কথা বলবে, সে নিজেও না, যখন সে বলল, 'কী জিজ্ঞাসা করব !' সত্যিই বিস্ময়ে অভিভূত তার গলার স্বর, যেন সে মূঢ়তাকে স্বচক্ষে দেখছে। যেন সে বলতে চায়, কী জিজ্ঞাসা করব ?

সামলে নিয়ে শান্ত গলায় বিজন বলল, 'ওঁকে যেতে বলো।'

মেয়েটি উঠে গেলে একটু পরে বছর-বারোর সেই মেয়েটি ছোড়দিকে ভিতরে ডেকে নিয়ে গেল।

ট্রেনে উঠে বিজন দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মেজদা আর ছোড়দি বসেছে পার্টিশনের ও-পাশে। সে একটা সিগারেট ধরাল। বাইরে হাজার হাজার বাড়ির ছুটন্ত অন্ধকার দৃশ্যের দিকে চেয়ে রইল, সে দেখল, সমস্ত ঘরে আলো জ্বলছে; দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দু'-তিনটে স্টেশন পেরিয়ে গেল, তার বসার ইচ্ছে হল। দিদির পাশে গিয়ে বসলে হয়, বেশ হয়, এই মেয়েটির সঙ্গেই তার বিয়ে হয়ে গেলে। প্রথমত, সে সাম্প্রতিক যুবক, এই ধরনের বিয়ে তার কাছে সব মিলিয়ে একটা কুৎসিত ব্যাপার। দ্বিতীয়ত, এই প্রথম সে মেয়ে দেখতে এল এবং এখানেই বিয়েটা হয়ে গেলে অন্তত এই আত্মসম্মানটুকু তার নিজের কাছে থাকত যে, এই ধরনের বিয়ের সুযোগ নিয়ে সে জঘন্য মেয়ে-বাছাই করে বেড়ায় নি, বাদবিচার না করে প্রথম-দেখা মেয়েটিকেই বিয়ে করেছে। মেয়েটি কলেজে পড়ে, পরে বকুলের মতো স্কুল-মাস্টারিও করতে পারবে—এই রকম দু'টি মেয়ের সঙ্গেই তো প্রাণপণ চেষ্টায় থাকার জন্য সে প্রেমে পড়েছিল বলে মনে করেছিল।

হাওড়া স্টেশনের ইয়ার্ডে যখন ট্রেন ঢুকছে, বিজনের হঠাৎ মনে হল, এ হে, দিদি যখন তাকে জিজ্ঞাসা করতে বলল, একটা প্রশ্ন তো সে অনায়াসে করতে পারত। মেয়েটি নিশ্চয়ই কোন ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করেছে, সেলাই ও গান জানে কি না, শুক্তো কী করে রাঁধে, এই সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়ে ক্লান্ত। তাকে সে জিজ্ঞাসা করলে পারত, 'আচ্ছা, ওটা কী

গাছ?' বাড়ির পাশের গাছ, মেয়েটি নিশ্চয়ই জানে, বলত, 'শিমুল।' 'শিমুল গাছে কখন ফুল ফোটে আপনি জানেন?' যদি লক্ষ্য না করে থাকে বা প্রশ্ন অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত বলেই হয়ত সে হকচকিয়ে যেত। জানলে যত অস্ফুট স্বরেই হোক তাকে উচ্চারণ করে বলতে হত, 'ফাল্গুনে।' মাথা নিচু করতে সে বাধ্য হত।

স্টেশনে নেমে দিদি বলল, 'ছাখ, ওদের ভেতরের ঘরে দেখলাম একজোড়া তবলা, ঘুঙুর, সেতার এইসব রয়েছে। তুই তো কিছুই জিজ্ঞাসা করলি না, আমি মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি বুঝি সেতার বাজাও?'

দিদির স্বরে অপ্রত্যাশিত নাটকীয়তা লক্ষ্য করে বিজন দিদির দিকে চাইল। জানার জন্য সে উদগ্রীব হয়ে পড়েছিল। চলতে চলতে দিদি বলল, 'না। ও বলল, গান জানে না। ওর বোন নাচে। সেতারও সে-ই বাজায়।'

'মণিমালা আমাকে ভুলে গেছে, চিনতে পারে নি মোটে…' টেবিলের ওপর রাখা কনুই-এ ভর দিয়ে দু'হাতের তালুতে মুখ রেখে সেদিন শ্বেত পাথরের মতো দেওয়ালটার দিকে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেয়ে রইল। মাত্র একহাত দূরে দেওয়ালটা, সে বোধ হয় পোকার চাউনি মেলে তাকিয়ে রয়েছে, তার চোখ ক্লান্ত হল না। টেবিলের ওপর ঢাকা দেওয়া ভাত ঠাণ্ডা হতে লাগল। পাশে কুঁজো, একগ্লাস জল।

চেয়ে থাকতে থাকতে সে হঠাৎ লক্ষ্য করল, একটা কালো

পিঁপড়ে দেওয়াল বেয়ে নেমে এল, পিঁপড়েটা টেবিল পার হচ্ছে। কী বিশৃঙ্খলভাবে টেবিল পার হচ্ছে পিঁপড়েটা, যেন তার কোথাও যাবার নেই। কিছুক্ষণ সে সেটার দিকে চেয়ে রইল। তারপর গ্লাসে আঙুল ডুবিয়ে তার চতুর্দিকে সে জলের একটা শূন্য এঁকে দিল। তার অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ নতুন ব'লে, সেটা শূন্যের ধারে-ধারে ঘুরতে লাগল তীরবেগে, বেরুবার জন্যে কী ছটফটানি তার। মাঝে-মাঝে হঠাৎ থেমে পড়ে, শুঁড় বের করে, জল শোঁকে, আবার ঘুরতে লাগে বোঁ বোঁ করে। এক সময় ক্লান্ত হয়ে প'ড়ে, অবশেষে শূন্যের মাঝখানটিতে চুপ ক'রে অপেক্ষা করতে লাগল।

এই সময়, যেন দুঃস্বপ্নের মধ্যে চিৎকার করার চেষ্টা ক'রে সে ব'লে উঠল, 'না,' যখন দিদি এসে তাকে ব'লে গেল, 'ও বলল, গান জানে না। ওর বোন নাচে। সেই সেতার বাজায়।'

গায়িকা হয়ে একজন যুবককে সে বলতে পেরেছিল, জানে না, সেতার বাজায় তার বোন, কী ক্ষমাহীন প্রত্যাখান মণিমালা তাকে করেছিল। পাশবিক অপমানের বোধ ভোঁতা ছুরির মতো উল্টে-পাল্টে মাংস কেটে ঢুকে যাচ্ছে তার বুকে। কী-রকম উল্টো পদ্ধতিতে, কী বেদনাহীন রক্তক্ষরণের মধ্যে দিয়ে সে আজ জানতে পারল যে, গান তার এমন প্রাণাধিক প্রিয়। গানকে এমন ভালবাসে, তাই সে এমন বদ্ধমূল অপমানিত, মণিমালা তার কাছে গান গোপন করেছিল ব'লে।

মণিমালার জন্য নয়, গানের জন্য তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় সে মূক হয়ে গেল। আজ সকাল থেকেই ঘুরে-ফিরে বেচুর কথা কেবলি মনে পড়ছে, আচ্ছা বেচু যদি কোনোদিন অভিনেতা হয়? সে ভাবল। সে হঠাৎ বেচুকে দেখল। তার পিঠ থেকে বাঁকানো

পিতলের তারের মতো রক্ত উঠছে ফিনকি দিয়ে, গুপ্তঘাতকের ছুরি পিঠে গাঁথা আহত বেচু, মঞ্চের মাঝখানে টলতে-টলতে এসে দাঁড়ায়। কোণাকুণি ভাবে পা-ফেলে বেচু চ'লে যাচ্ছে উইংসের দিকে, টেবিলের দিকে চেয়ে-চেয়ে অগণিত দর্শকের মধ্যে ব'সে থাকা নিশ্চুপ সে, সেই অলীক মূকাভিনয় প্রত্যক্ষ করল।

সে এ-বার দেখল, জল শুকিয়ে গেছে। শূন্য থেকে বেরিয়ে সেটা কুরকুর ক'রে হাঁটছে। দু' আঙুলে সেটাকে সে তুলে নিল। দাঁড়িয়ে উঠে চিৎ ক'রে ঢাকা আলোর নিচে মেলে ধরল। সেটা ছটফট করছে, কিলবিল করছে তার পাগুলো, পিঁপড়েটা তাকে, হ্যাঁ, তাকেই, দেখছে, স্পষ্ট অনুভব করল সে তার চাহনি, দাঁড়া দুটো ফাঁক ক'রে পিঁপড়েটা তাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে। দুই আঙুলে সে তার শরীরের প্রবাহ অনুভব করতে পারল।

তার চোয়াল ন'ড়ে উঠল। কিলবিল-করা পাগুলোর একটা ধ'রে মৃদু টান দিল সে, ছিঁড়ে গেল পা-টা, ক্রমে এককণা রস জমে উঠল সেখানে। শরীরটা দুমড়ে সামনের অর্ধেকটা উঁচু ক'রে তুলে ধ'রে—ঠিক তার আগের মুহূর্তে শুড় জড় ক'রে, যেন করযোড়ে, সেটা তার দিকে চেয়েছিল।

পিঁপড়েটাকে টেবিলের ওপর ছেড়ে দিয়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল সে। আহত পিঁপড়েটা লেংচাতে-লেংচাতে কোণাকুণিভাবে পার হচ্চে টেবিলটা। যাবে কোথায়! কেউ তো হাঁটা থামায় নি, সকলেই চ'লে গেছে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ও ঘুরেই মরবে শুধু। ওর স্পৃহা কী ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর, তা ওর চাহনি দেখে সে বুঝেছে, যতদিন যাবে ছোট-পিঁপড়েটার

হিংসা বাড়বে, বাড়বে অবর্ণনীয় বেদনার বোধ, বাড়ুক, আত্ম-হনন ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে ওর প্রতিহিংসা চরিতার্থ হবে না কোনোদিন। মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত ওর সবই মনে থাকবে, ওরা কোনোদিনই সেরে ওঠে না, মানুষের মতো সে কিছুই ভুলে যেতে পারবে না।

সে দেখল পিঁপড়েটা টেবিলের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। ঝুঁকে প'ড়ে সেদিকে তাকিয়ে তার মনে পড়ল, দশ বছর আগে ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় সে একবার সিংভূমে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে একটা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে একজন লোককে সে বহু সময় ধরে নিচের উপত্যকাটা পার হতে দেখেছিল। একা ব'লেই লোকটি সে-দিন তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, আজ বুঝতে পারল বিজন।

মী রা বা ঈ

ভূ মি কা

বাড়িতে টিয়া থাকলে, কাঁশি বাজিয়ে বাসনঅলা চলে যাবার পর নিঃসঙ্গ দুপুরে সে হঠাৎ 'চ্রিক্' করে ডেকে ওঠে। তার-পর শৃঙ্খলাবদ্ধ এক-পা তুলে, ঘাড় কাৎ করে দাঁড়িয়ে থাকে কান পেতে। প-ফেলে পা-ফেলে বাসনবোঝাই মুটেটাও গলি দিয়ে চলে যায়। পাশের বাড়িতে টিয়াপাখি থাকলে তখন সে তার উত্তর দেয়। উত্তর শুনে, এ-বাড়ির টিয়ার সে কী ছটফটানি ; যদিও চাপা অহংকারে গলা ফুলে যায়, লাল বৃত্তের ভিতর চোখদুটো পাল্টে যায় ঘন-ঘন, কিন্তু উত্তেজনা প্রকাশ করে না তবু, হাঁটে পদক্ষেপ গুনে গুনে—দাঁড়টা তাই সম্পূর্ণ ঘুরে যায় না, হাওয়ায় দোলে। আমাদের বাড়ির টিয়াটার সঙ্গে পারেকসাহেবের বাড়ির টিয়াপাখিটির বন্ধুত্ব পুরানো হতে চলল।

পারেকের বাড়ি মানে আমাদের বাড়িরই একটা অংশ, আমরা বলতাম ছোট বাড়ি, একদিন ওটা আমাদেরই বাড়ি ছিল। ঠাকুর্দার আমলে বিক্রী হয়ে যায়, কিনেছিল পারেকের মামা। ছোটবাড়ি ও আমাদের বাড়ির মধ্যে তাই মিউনিসিপ্যাল

আইনের চার ফুট ফাঁকও নেই। ওদের একতলা বাড়ির ছাদ আর আমাদের দোতলার দালানের মাঝখানে তাই একটা শাদা দেওয়াল, দেওয়ালের গায়ে প্রায় দেড়মানুষ-উঁচু এক বিশাল জানালা, একদিন সম্ভবত যেটা দরজা ছিল। জানালাটা ছিল আগাগোড়া একটা জাল দিয়ে মোড়া, আজও আছে, গরাদের ওপাশে ছোটবাড়ির ছাদের দিক থেকে আঁটা। দ্বিতীয়পক্ষের বউ ঘরে আনার পরে পারেক সাহেব ওটা নিজের হাতে এঁটে দিয়েছিলেন।

পারেকসাহেবের বউ, মানে আমাদের কৈশোরের মীরাবৌদি। আসলে কী নাম ছিল কে জানে, ওরা দেশী খ্রীষ্টান, হয়ত ছিল মেরী, কিন্তু মা ডাকত মীরা। কী রূপ ছিল মীরাবৌদির।

জ্বলন্ত টর্চ-লাইট চেপে ধরতাম ছেলেবেলায়, মুঠি-করে-ধরা সেই আঙুলগুলি মনে পড়ে, আর মনে পড়ে মীরাবৌদির গায়ের রঙ। বহুদিন পর্যন্ত মা বলত, তাও মনে পড়ে, 'ও যখন ঘোমটা দিত, ওর লাল কপাল আর শাড়ির পাড় আলাদা করা যেত না।' অমন পাকা শরীর আমি দেখি নি, মনে হত এই বুঝি ফেটে যাবে তা, যা দশবছরের দাম্পত্য-জীবন সত্ত্বেও টাল খায় নি কোথাও।

উরুদুটো পরস্পর এত ঘননিবদ্ধ ছিল যে, ছেলেবেলায় তা নিয়ে কিম্ভুত ভাবতাম। ভাবতাম যে, মীরাবৌদির পা-দু'টি বোধহয় হাঁটুর নিচু থেকে শুরু হয়। পা ফাঁক করে হাঁটতেন যখন, যখন রাজহংসীর মতো পা ফাঁক করে, গোড়ালি থেকে আঙুল পর্যন্ত পায়ের পুরো পাতা পড়ত। অতগুলি ছেলে-পিলের মা হয়ে ছিলেন শেষ পর্যন্ত, অথচ যখন হাসতেন, রুক্মিণীর হাসির কথাই আমার মনে পড়ে যেত। কোলজোড়া শেষতম

মেয়েটির ওপর কাচের চুড়িবোঝাই সোনালি লোমে-ভরা দু'টি হাত, ঢালু কাঁধ, প্রতিমার পরচুলার মতো কৃষ্ণ এলোচুলে ঢাকা কান, কানে সোনার ফুল, ছোট্ট কপালে গোল সিঁদুরের টিপ—জানালার জালের ওপাশে সোনার দুপুরে বসে-থাকা সরু মফ্‌চেন ও রূপালি ঘামের দু'গাছি হারসমেত বাঁকানো গ্রীবার ওই মূর্তিটি আমার আজও মনে পড়ে। মীরাবৌদির সবই স্পষ্ট মনে পড়ে, কিছুই অনুমান করতে হয় না, শুধু চোখ দুটি ছাড়া। কেমন বা ছিল তার চাহনি, সুদীর্ঘ পাতা ছিল কি চোখের? খুব টানা-টানা ছিল কি, চোখের তারা দু'টি কি ছিল মার্বেলের মতো বড় বড়? আমার মনে পড়ে না মোটে। আর মেয়েদের চোখের দিকে চোখ তুলে চাইবার বয়সও সেটা ছিল না।

আজ আর মা নেই যে জেনে নেব। 'সাবিত্রীসমান হও মা,' মা বলত বৌদিকে, 'তোমার সিঁদুর-আলতা অক্ষয় হোক।' পাড়ায় বলে বেড়াত, 'সাক্ষাৎ মীরাবাঈ। ওর মতো সতী এ-যুগে হয় না। পারেকটা বাঁদর, মীরার মর্ম ও কী বুঝবে?'

পারেকসাহেবকে আমরা কদাচিৎ কথা বলতে শুনেছি। শুনে থাকলেও মনে নেই। মাঝে মাঝে শুনেছি শুধু ভয়ঙ্কর গলা খাঁকারি দেবার আওয়াজ। যেন কেউ তাকে ভয় দেখাতে এসেছে, তিনি তাকে ভয় পাইয়ে দিতে চান। পরণে চেকলুঙ্গি, আদুড় গা, বুকে চুলের জঙ্গল, গা ভর্তি বঁড়শির মত লোম ও ছড়ানো কুচি বিচির মতো একরাশ লাল তিল, মাথায় একচাপড়া কোঁকড়ানো চুল, যার দু-চারগুছি সবসময়েই ফণা তুলে থাকত। হাঁটতেন থপথপ করে, বুড়ো গরিলার মত বিশ্বাসে। বসন্তক্ষতে বিকৃত তাঁর বীভৎস ও ফর্শা নতমুখ আমরা দৈবাৎই দেখে

থাকব। পারেকসাহেবের ভ্রূ-কুঞ্চন মনে পড়ে, ভ্রূ-দুটো ঠেকাতে পারতেন, যেন দুটো জোঁক পরস্পরের রক্তপান করে কালো হয়ে যাচ্ছে। সকালবেলায় যে ঘণ্টাকয়েক ছাদে থাকতেন পারেকসাহেব, একমনে কব্জি দিয়ে কোপাতেন টবের মাটি, সার গুলতেন কনুই অব্দি হাত ডুবিয়ে। কাঁচি দিয়ে আলতোভাবে, যেন ভালবেসে, পোকাধরা পাতাগুলি কেটে দিয়ে পাউডার ছড়িয়ে দিতেন তার ওপর। ঝাঁঝরি দিয়ে জল ঢালতেন গাছের গায়ে, মগে করে গোড়ায়। এই সব করতেই সকাল গড়িয়ে যেত, দোকানে বের হবার সময় হয়ে যেত তাঁর। এ-সব কাজই তিনি করতেন হেঁটমুখে, ব্যস্ত না হয়ে বিনয় সহকারে। মাথা তোলবার অবকাশ কোনদিন হয় নি।

এ-ছাড়া ছিল পাখি। ছেলেবেলায় ঘুম থেকে উঠে প্রতিদিনই আমার মনে হত, বুঝি জলধারার পাশে শুয়ে আছি। পরমুহূর্তেই হতাশা। না, মীরাবৌদি স্নান করছেন। কী যে স্নান করতেন একঘণ্টা ধরে, গা থেকে রগড়ে কী যে তুলে ফেলতে চাইতেন অতক্ষণ ধরে, আর অত ঘটা করে! তুমুল শব্দ হত, মনে হত মীরাবৌদি বুঝি জলপ্রপাতের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন। কতদিন জলপ্রপাতের স্বপ্ন দেখতে-দেখতে জেগে উঠে ভেবেছি, আমি কি স্বপ্ন দেখছি নাকি। কোনদিন বা ঘুম ভেঙেই মনে হত, 'আরে, বাগান?'

সত্যিই, পারেকসাহেবের বাড়ি ছিল পাখিতে ভর্তি। কত রকমের যে পাখি ছিল, চিড়িয়াখানা বললেই হয়। চার-পাঁচটা টিয়াপাখি তো ছিলই, হরিয়াল ছিল, বুলবুলি টুনটুনি ছিল, রাঙা খাঁচায় ছিল বন্দী কোকিল। একটা কমলা রঙের ল্যাজঝোলা ছিল, কাকাতুয়া পায়রা ছিল অনেক। কালো সিল্কের তাফ্‌তায়

মোড়া মস্তবড় খাঁচায় ছিল একটা সোনালি ময়না। একদিন পর্দা তুলে দেখেছিলাম। কথাকলির মুখোশের মত কারুকার্যকরা ভীষণ সুন্দর, কী বিপুল চোখ ছিল তার।

ছাদের এককোণে জালের ঘরে আর ছিল একটা ময়ূরী। আমাদের এ-তল্লাটে আর কারো বাড়িতে ময়ূর নেই, কুণ্ডুরা অত বড়লোক, তাদের বাড়িতেও ছিল না। নূরওয়ালা, শ্বেতির দাগে ভর্তি এক রোগা মুসলমান নিত্য আসত, সাইকেলের ঘন্টি শুনতাম বিছানায় শুয়ে। পাখিদের জন্যে সে আনত নানারকম পোকামাকড়, টিয়ার জন্যে টুকটুকে তেলাকুচে। ময়ূরীর জন্যে আনত হরেক জিনিস দিয়ে মাখা পাউরুটির একটা গোল্লা, এক ঠোঙা কেঁচো। কোনদিন দিয়ে যেত আধমরা সাপ। দু'আঙুলে সাপটাকে চাবুকের মতো করে ঝুলিয়ে, লোমশ ও বিশাল পারেকসাহেবেকে দরজা খুলে ময়ূরীর ঘরে প্রবেশ করতে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। দরজা বন্ধ হয়ে যেত সশব্দে। ভিতরে সাপের হিস্ হিস্, শানের ওপর ঠোঁটের ঠোক্করের শব্দ, পাখার ঝটপটানি, এই সব শুনতে পেতাম। শব্দহীন শুধু পারেকসাহেব। কোনদিন পাখার ঝাপটায় টিনের চাল বেজে উঠত ঝন্ ঝন্ করে। ময়ূরীটা ডাকত বছরে কয়েকবার, কিন্তু বাকি এতগুলি পাখি অন্ধকার থাকতেই মাঝে-মাঝে ডেকে উঠত, চেঁচামেচি শুরু করে দিত আলো ফুটলে। ভোরে ঘুম ভেঙে গেলে তাই আমার কতদিন মনে হয়েছে, 'আরে, বাগান!'

কিন্তু সে যাই হোক ফুল-ফোটাবার ভারি মিষ্টি হাত ছিল পারেকসাহেবের। লাটসাহেবের বাড়ির প্রদর্শনীর সবচেয়ে বড় সূর্যমুখীর চেয়ে দু-ইঞ্চি বড় ফুল পারেকের টবে সবসময়েই থাকত। নকশা-করা লাল টবে ছাদের কার্নিশ কোনোদিনই

দেখা যেত না, দিশিবিলিতি নানাজাতের ফুলে ছাদ বোঝাই হয়ে থাকত। আজ যদি আমি বলি, 'আমি পুষ্পের প্রতিমা দেখেছি, পারেকের টবে ফুটে থাকতে দেখেছি বিরল অ্যাজেলিয়া,' কেউ আমাকে বিশ্বাস করবে কি, করবে না! একটা গাছ ছিল, তার ফুলে আঠার-উনিশটা পাপড়ি হত, (আমি আর রুক্মিণী সংখ্যার ওপর বাজি ধরে তার পাপড়ি ছিঁড়তাম)। প্রত্যেকটি পাপড়ির রঙ ছিল আলাদা, কিন্তু তাদের সমবেত রঙে একটা নীলাভা ছিল। কী তীব্র মত্ততা ছিল তার গন্ধে, নীল কানপাশার মত সেই ফুলে। আমরা বলতাম পাগলাফুল।

আর হত গোলাপ, ইজিহিল, বার্সিলোনা, এটোলি-ডি-লিঅন—এইসব। একটা কালো গোলাপের গাছ ছিল। এক ঋতুতে সাত আটটার বেশি ফুল হত না। ফুল ফোটার আগে তার সারাগায়ে বড় বড় কাঁটা দিত। সেই গোলাপগুলির একটি আমাকে দিয়ে, হাড়-চিবোবার সমর্থ শাদা দাঁতগুলি বের করে পারেক একদিন মাকে বলেছিল, ব্ল্যাকপ্রিন্স কি ভারতবর্ষে জন্মায় মাসিমা, জন্মাবে কেন! এ হল নিগ্রিটি। গেল বছর বেরিয়েছে এই ফুল।' মা কত সলাপরামর্শ নিত, কত রকমের সার দিত, পারেকসাহেবের কাছে প্রায়ই চেয়ে নিত কলমকরা গোলাপ ডাল, চারা কি বীজ। কিন্তু মায়ের হাতে তেমন ফুল ফুটত কৈ! মা তাই বলত, 'তোমার হাতদুটো আমাকে দাও পারেক। নইলে ফুল হবে না।'

ওইরকম অদ্ভুত নেশা ছিল পারেকসাহেবের। পারেকসাহেব গাছ পেলেই টবে পুঁতে দিত। পাখি পেলেই খাঁচায়।

যতদূর বিশ্বাস, পারেকসাহেবের বাড়ি থেকেই আমার কিশোরবয়সী মনে প্রথম অলৌকিক রহস্যের চেতনা আসে। ছোট-বাড়িটা ছিল, যে-কোনো খণ্ড আংশিক জিনিস যেমন, শ্রীছাঁদহীন—একটা দেশলাইএর খোলের মতো। না কোনো বারান্দা, না রোয়াক, না একটা বড় উঠোন কি লম্বা দালান, কিছুই ছিল না। সারাদিন আমাদের বাড়ির ছায়া পড়ে থাকত তার গায়ে, রোদ্দুরের জন্য ছোটবাড়িটা অপেক্ষা করে থাকত অপরাহ্নকাল পর্যন্ত। রাস্তার দিকের আলকাৎরা-মাখানো জানালাদুটি বন্ধ থাকত সবসময়, দরজাটা প্রয়োজনে ছাড়া খুলত না। বাইরে আসা দূরে থাক, খেলার জন্যে বাড়ির ছেলেমেয়েদের ছাদে পর্যন্ত উঠতে দেখা যেত না।

ছোটবাড়ির ছাদে রোজ সকালে পারেকের এঁটিলি-মারা লোমশ পিঠ তাই আমায় ভয় দেখাত, যদি পারেকসাহেব ঘুরে দাঁড়ায়, তাঁর রক্তের ছাট-ধরা চোখের ওপর পরস্পর রক্তচোষা জোঁকদুটি কপাল জুড়ে বেঁকে যায়, যদি। তবুও কৌতূহল! আকাশ ঝুলে পড়েছে মেঘে, ভিজে হাওয়া বইছে সোঁ সোঁ, ময়ূরীটা কই ডাকছে না তো। কী করছে সে জালের ঘরে? রুক্মিনী কী করে দুপুরবেলা? ঘুমোয় না পড়ে, না শুধু জেগে থাকে আমার মতো? পড়ে, মেঘ করলেও পড়ে?

ও-বাড়িতে আমরা কালেভদ্রে যেতে পারতাম, কাজেকর্মে। পারেকসাহেবের মামা যখন মারা যান, মেহগিনি খাটের পালঙ্ক থেকে তাঁকে ইঁদুর-আরসোলায় ভর্তি ভাঁড়ার ঘরে শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল। মামা বেঁচে থাকতে থাকতেই নতুন বউকে নিয়ে পারেক তাঁর পালঙ্কে শুত, মামার অসুখের সুযোগ নিয়ে দোকানটা লিখিয়ে নিয়েছিল, মৃত্যুর পর বাড়িটা গ্রাস করেছিল

মামীমাকে ঠকিয়ে। কালো কাপড় পরে, গলা অব্দি ঘোমটা টেনে, পারেকের মামীমাকে একদিন ছেলেপিলের হাত ধরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছি।

পারেকের মামার মৃত্যুদৃশ্যে আমি মায়ের আঁচল ধরে ঘরের কোণে বসেছিলাম। ঘরভর্তি আত্মীয়স্বজন. তার মাঝখানে একপাল বোকা ছেলেমেয়ে নিয়ে পা ছড়িয়ে বসে তাঁর বোধহীন স্ত্রী। রবীন্দ্রনাথের মতো সোনালি দাড়ি ছিল পারেকের মামার, মহাভারতের রাজা যযাতির ছবির মতো তিনি শুয়েছিলেন, স্থবির বুক থেকে ফতুয়ার সবকটি বোতাম খুলে দেওয়া হয়েছিল, তাঁর ফেটেপড়া চাহনি পারেকসাহেবকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

পারেকসাহেব এলেন মধ্যরাতে, কালো কিংখাবের মতো লরেন্স কোম্পানীর গম্ভীর গাড়িতে চেপে। ঘুম থেকে জেগে উঠে আমরা সবাই অন্ধকার বারান্দা থেকে সারবন্দি ঝুঁকে রইলাম। কফিনটা রাস্তায় নামানো, তার চতুর্দিকে হি হি ঠাণ্ডার মধ্যে ঘোরাঘুরি করছে কয়েকটি ছায়াশরীর, চাপাস্বরে ব্যস্ততাহীন কথাবার্তা বলছে সকলেই, দূর থেকে দূরে বসানো গ্যাসলাইটগুলো ধোঁয়া ছাড়ছে, সম্মুখের সমস্ত পথটা আলোকিত করে গাড়ির হেডলাইট জ্বলছে। আলোয় বৃষ্টির কণা উড়ছে ফর্ফর করে, অদূরে মোড়ে দীর্ঘ ডাকবাক্স নীরব ও নতমুখ মানুষের বর্ণনার মত দাঁড়িয়ে।

এরই মধ্যে একবার পারেকের উদ্ধত গলা-খাঁকারি শোনা গেল। একটু পরে গলি দিয়ে লম্বা গাড়িটা ক্রিমেটোরিয়ামের দিকে বেরিয়ে গেল হর্ন না দিয়ে। ভিড় সরে গেল। কোনো জানালা খোলেনি, ছোটবাড়ির দরজা শব্দ করে বন্ধ হল। সেদিন বাড়ির ভিতর রোদনের কোনো চিত্ররূপ ছিল কিনা বলা যায়

না, কিন্তু যতক্ষণ দরজা খোলা ছিল কান্নার অস্ফুটতম কোনো ধ্বনিও বাইরে আসেনি।

মা বলল, 'শয়তান!'

বাবা বলেছিলেন, 'ও ভোগ করতে পারবে ভেবেছ, ওর বুকে বজ্রাঘাত হবে।'

পারেকের দ্বিতীয়পক্ষের বৌ মীরাবৌদি এল মামার মৃত্যুর কিছু আগে। পারেকসাহেব তখন সদ্য লাগিয়েছেন সেই পাগলা-ফুলের চারা, তখনো তার ফুল হয়নি, তখন তার সমস্ত পাতাই নবীন, রাতারাতি উৎসাহে বেড়ে উঠে পামগাছটার-পা জড়িয়ে, খাঁজকাঁটা সরস গা জড়িয়ে, গলা পর্যন্ত লতিয়ে উঠবে। এই আশায় পারেকসাহেব চারাটা পুঁতেছিলেন পামগাছের গোড়ায়।

মীরাবৌদির চোখের সামনেই পারেকের বিধবা মামীমা ছেলেপিলের হাত ধরে অধোবদন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন একদিন। মামীমা ঝি-গিরি করত, বেশি দূরে নয়, তাও মীরা-বৌদির শ্রুতির মধ্যেই ছিল। একদিন পারেক ছাদের সুদীর্ঘ জানালাটা জাল দিয়ে মুড়ে দিল। জালের ওপাশে ছাদের আলসেয় বসে কতদিন দুপুরবেলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মীরাবৌদি বলেছে, 'কী করব মামীমা। আপনার ছেলেকে তো জানেন।'

পারেকের বাধানিষেধ ছিল অনেক। ছাদে ওঠা বৌদির বারণ ছিল। তবু পারেকসাহেব দোকানে বেরিয়ে গেলে মীরা-বৌদি রোজ দুপুরে এসে বসত ছাদের আলসেয়।

স্কুল থেকে ফিরে কতদিন দেখেছি, তখনো দিদির সঙ্গে আড্ডা চলছে। আমাকে দেখলেই বৌদি বলে উঠত, 'কী গো, পা-পা-পা পাঁউরুটি?' আমি ছিলাম তোৎলা। দিদি বলত,

'যা, কেন লজ্জা দিচ্ছ বেচারাকে।' আমি বসে পড়তাম দিদির গা ঘেঁসে।

দিদি বলত, 'লাল শায়া পরেছ, পারেকসাহেব জানতে পারলে?'

বৌদি বলত, 'ধুর!'

'আচ্ছা, তবে কিনে দেয় কেন, পরবে না যদি?'

'পরি তো।'

'কখন পরো?' দিদি যেন জানে না কিছু।

'পরি।' মীরাবৌদি বলত অধরে জিভ বুলিয়ে।

'রাত্তিতে পর?'

'যাঃ। নেকি কোথাকার! মীরাবৌদি রুক্মিণীর মতো হেসে ফেলত ফিক করে।

'আচ্ছা বৌদি,' অস্থির হয়ে উঠে দিদি এক-একদিন বলে উঠত, 'তোমার যে এত দামি দামি জামাকাপড়, তোরঙ্গভর্তি, আলমারিভর্তি। কই, পরো না তো কিছু।'

'কেন, এই তো পরেছি।'

'এ তো বিচ্ছিরি। সস্তা।'

'কী করব রে।' মীরাবৌদির লাল মুখটা বড় অসহায় দেখাল, 'তোর দাদা যে এই বের করে দিয়ে গেল আজ। অন্য কিছু পরলে, জানিস তো, রক্ষে আছে!'

'সিল্ক পরো না? জর্জেট পরো না, ব্রোকেডের সেই ব্লাউজটা?'

'পরি তো।'

'রাত্তিরে?' দিদি চোখ নামিয়ে জিজ্ঞাসা করত ফের।

'আচ্ছা মীরাবৌদি,' একটু চুপ করে থাকায় হঠাৎ মনে পড়ে যায় দিদির, 'সেই লালপাড় গরদটা তো পরলে না কোনদিন।'

'ওমা, কোনটা বলত!' ভুরু তুলে, ঘাড় কাৎ করে, পা ছড়িয়ে মীরাবৌদি ভাবতে বসত, 'ইশ! সেই গেরুয়া-রঙেরটা, পুজোর সময় সেটা বাগবাজার একজিবিশন থেকে কিনেছিলাম, না? সত্যিই তো, ওটা তো পরিনি কোনোদিন।' এরপর মীরাবৌদি চুপ করে বসেছিল অনেকক্ষণ। সূর্যের পড়ন্ত আলোয় ক্রমশ রক্তিম হয়ে উঠেছিল তার মুখটা, ব্যথায় করুণ দেখাচ্ছিল। যেন জ্বর হয়েছে তার। গ্রীবা বাঁকিয়ে সূর্যের দিকে চেয়ে অতক্ষণ কী ভাবল কে জানে, দিদিও জিজ্ঞাসা করার মতো আর কিছু না পেয়ে চুপ, হয়ত মীরাবৌদি তার ভুলে যাওয়া গেরুয়া-বসনের জন্যে অত্যন্ত মমতা বোধ করছিল।

হঠাৎ কী মনে পড়ায় চকিত হয়ে উঠে বৌদি বলল, 'ঐ যা, একদম ভুলে গেছি।' উঠে দাঁড়িয়ে দিদির দিকে চেয়ে বলল, 'ওটা কী পরেছিস রে, ধুতি, কার, বিশুঠাকুরপোর? কেন তোর থান কী হল?'

বিশেদা আমার পিসতুতো দাদা, বিধবা হবার পর পিসীমা তাঁর একমাত্র সন্তানকে পেয়েছিলেন, তা ছোটবেলাতে পিসীমাও মারা যান। আমার জন্মের আগের ষোলোবছর বাবা-মার অপত্যস্নেহে বিশেদারই একমাত্র অধিকার ছিল।

আমার ছ'বছর বয়সের সময় যুদ্ধ বাঁধে, কিরকিতে মাস-আটেক ট্রেনিং নিয়ে বিশেদা যুদ্ধে যায়। কোনো স্মৃতি ছিল না বিশেদার, কিন্তু এটা আমার বড় আশ্চর্য লাগত যে, ডাক-টিকিট লাগে না, শুধু খামের উপর 'অন হিজ ম্যাজিস্টিস সার্ভিস' লোকো ড্রাইভার ১০০০৭, এফ, পি, ও,' লিখে দিলেই তার কাছে আমার চিঠি চলে যায়।

মণিপুর রোড স্টেশন অবধি ফ্রন্টে এঞ্জিন চালাত বিশেদা।

যুদ্ধের শেষাশেষি বাঁ-হাতের কব্জি জখম হওয়ায় ফিরে এল। তখন জাপানীরা পশ্চাদপসরণ করেছে। হসপিটাল হিল দখলের জন্য তুমুল যুদ্ধ হচ্ছে তামু-প্যালেল রোডে।

পিঠে হ্যাভারস্যাক, কাঁধে ফেল্টের ওয়াটার-বট্‌ল ও শাদা কলায়ের মগ, জামার পকেটে ও কাঁধের ফিতেয় আঁটা নানারকম স্মারকচিহ্ন—বুটের শব্দ তুলে হেঁটে এসে, বিশেদা যেদিন দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকল, 'মামীমা,' বস্তুত বিশেদা-সম্পর্কে আমার স্মৃতির সেইদিন থেকে শুরু। সেদিন ছিল দোল, আমার জ্বর হয়েছিল। জানলা ফাঁক করে আমি দেখেছিলাম, বিশেদা মোড় বেঁকল; পরনে নীল মিলিটারি স্যুট তার; ভারি বুটের শব্দ তুলে রঙিন রাস্তা মাড়িয়ে হেঁটে এল সমস্ত গলিটা, পাশে বাবা; দেখেছিলাম শম্ভু, বাদল, মহিম, লাবি, রুক্মিণী এরা সবাই পিচকিরি নামিয়ে নিল একে একে, ভয়ে কেউ বাবার গায়ে পর্যন্ত রঙ দেয় নি। বিশেদাই জানলার জালের গায়ে কনুই অব্দি হাত ঢোকাবার মতো করে চৌকো গর্তটা কেটে দেয়।

পারেকসাহেব বেরিয়ে গেলে দুপুরে খাওয়াদাওয়া সেরে কাপড়জামা শুকুতে দেবার জন্যে মীরাবৌদি ছাদে উঠত রোজ। জালের ওপাশে বসে থাকা তার অলস-মূর্তি বেশ মনে পড়ে, পাশে আলসের ওপর রাখা মেয়েদের জামাকাপড়, পারেকের চেকলুঙ্গির পাশেই নিঙড়ানো শায়া, নিঙড়ানো তার চুলগুলিও। পিঠময় ভিজে চুল, খোঁপা আমি কখনো দেখিনি। চুলের যত্ন নিত না মীরাবৌদি। আজ মনে হয় বিবাহিত-জীবন তার খুবই ব্যস্ততায় কেটে থাকবে, নিঃশ্বাস ফেলার সময় পেল আর কই, দশবছরের বিবাহিত জীবনে তাকে আটটি সন্তান প্রসব করতে হয়েছিল।

সূর্যের দুপুরে কি মেঘের, মীরাবৌদির কথা মনে করতে গিয়ে এখন মনে হচ্ছে, বৌদি যেন জালের ওপাশে তার উঁচু পেট নিয়ে বসে আছে, ঋতুগুলি তার মুখে ছায়া ফেলে চলে যাচ্ছে। শীতে তার শরীর কাঁপছে, শাদা র‍্যাপারের ভিতরে হাত গুটিয়ে নিচ্ছে মীরাবৌদি, গ্রীষ্মে ঝকঝক করছে তার কনুই হাত থ্রি-কোয়াটার ব্লাউজ, কনুইএর পর থেকে আলসের ওপর রাখা তার এলানো হাত নিশ্চল পথের মত পড়ে আছে, গ্রীষ্মেররোদ্দুরে পথের মতোই উপায়হীন জ্বলে যাচ্ছে ; খোলাহাওয়ায় উড়ছে তার চুল, চিলের ডাক শুনে মীরাবৌদি আকাশের দিকে মুখ তুলেছে; পরমুহূর্তে সমস্ত উজ্জ্বলতা ম্লান করে দিয়ে মেঘ তার মাথার ওপর এসে দাঁড়ায়। টপ্ করে একফোঁটা জল পড়ে হাতের ওপর। নগ্ন বলতে শুধু হাতটুকু, শিউরে তুলে নিয়ে হাতের দিকে চেয়ে আছে মীরাবৌদি, যেন ওটা তারই একখণ্ড, বলছে, 'ইশ, ভগবানের কথা মনে পড়ল রে।'

'আজ যে পান খাচ্ছ বড়, পান তো রাত্তিরে?' জালের এপাশে বসে দিদি জিজ্ঞাসা করল।

'কী করব, বমি পাচ্ছিল যে বড়। যাকগে ধুয়ে ফেলব।' তারপর বৌদি বলল, 'তোর দাদার জ্বালায় আর পারি না ভাই।'

দিদি গালে হাত রাখল, 'সে কী গো, এর মধ্যেই?'

কোমরের আড় ভেঙে, নাকের পাতা ফুলিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মীরাবৌদি বলত, 'আর পারি না।' দিদি বলত, 'সে কী গো, খাওয়াচ্ছ কবে?'

মীরাবৌদির ঠোঁটদুটির কথা ভেবে এখনো বিস্ময় বোধ করি। শুকনো ঠোঁট শীতে অসম্ভব ফাটত, জিভ বুলিয়ে বুলিয়ে

শাদা করে ফেলেছিল। বোজা থাকলে হাঁ-মুখটা দেখাত এতটুকু, বাচ্চা মেয়েদের মত ছোট, কথা বলার সময় ছোট, কান্নার সময় চাপা সরলরেখা, হাসতেন যখন শুধু তখনই কী অসম্ভব বেড়ে যেত ঠোঁটদু'টি, অত ছোট ছোট দু'টি ঠোঁট দিয়ে কী করে অমন চওড়া হাসি হাসত মীরাবৌদি আমি জানি না, যদি কখনো কোন মহিলাকে ও-রকম হাসতে দেখি আর, তাকে জিজ্ঞাসা করব। মীরাবৌদি হেসে বলত, 'বা, বিয়ের আগেই নেমন্তন্ন খাবি নাকি ?'

সারাদুপুর দরজার পরিবর্তে জাল-আঁটা সেই বিশাল জানালার পাশে মীরাবৌদি বসে থাকত রোজ। রোজই লেভেল ক্রশিং-এর গেট নেমে আসত একসময়, তীব্র সিটি বাজিয়ে দূর থেকে ছুটে আসত মেলট্রেন, নাটবল্টু পিস্টনফিসপ্লেট, বগির ঠোকাঠুকি, সব মিলিয়ে আওয়াজ হত ঝন ঝন ঝন, ছুটন্ত ট্রেনে লহমায় লহমায় মুখ, এগসস্ট-পাইপ থেকে গলগল করে ধোঁয়া উড়ে এসে গ্রাস করত তাকে, দু'হাতে কান চেপে ধরে ধোঁয়ার ভিতর থেকে আবার পরিস্ফুট হয়ে উঠত মীরাবৌদি, তারপর আবার সেই বসে-থাকা।

বছর বছর মেয়ে হত, মেয়েদের প্রতি মীরাবৌদির নিষ্ঠুরতা ছিল জানোয়ারদের থেকেও বেশি। জন্তুজানোয়ারদের তবু একটা বয়স পর্যন্ত সন্তানের প্রতি মমতা থাকে, তার তাও ছিল না। অমন টসটসে শরীর, বহুবছরের দাম্পত্য জীবন সত্ত্বেও কোথাও টাল খায় নি যা, কিন্তু কিশোরী মেয়েদের মত তার ছোট ছোট স্তনে দুধ হত না একফোঁটা। অনেক ইনজেক-শন নিতে হয়েছিল, নামকরা ডাক্তার দেখিয়েছিলেন পারেক, কোন ফল হয় নি। প্রতিবছরই বস্তি থেকে সদ্যপ্রসূতির ডাক

পড়ত তাই। ছ-সাত মাস মোটা মাইনে দিয়ে তাকে রাখতে হত। অথচ শেষ সন্তান গর্ভে আসার পর থেকে প্রসবের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সে কী উত্তেজনা তার। এটার নাকটা কী-রকম হবে কে জানে, টিকোলো হবে কি, মেনির মত খাঁদা না হয় আবার। 'ব্যাটাছেলের চোখের তারা বেশ বড় বড় হবে, বুঝলি ঠাকুরঝি, ভ্রূ-দুটো হবে টানা-টানা, তবে তো।'

'ইশ, নড়ছে যে রে পেটের ভেতর।' শিউরে উঠে একটু পরে আধোজাগা গলায় মীরাবৌদি বলত। দু'দিকে অবিরল অস্থিরভাবে মাথা নাড়িয়ে বলত, 'ভীষণ, ভীষণ কালো হবে, আমার ছেলেকে যেন কোনদিন কাজল পরতে না হয়। কী করে বলব তোকে কেমন হবে তার চাউনি, কত বড় বড় হবে তার চোখের পাতা, বুকের ভেতর গিয়ে পড়ে থাকবে।'

'আর গায়ের রঙ?'

'সত্যি সত্যি বলছি', জালের ওপাশে উনুনের মাটি চিবুতে চিবুতে বৌদি বিরক্তমুখে উত্তর দিত, 'ফর্শা ব্যাটাছেলে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। আমার গা ঘিনঘিন করে— এ ম্যাগো!'

পারেকের মা ছিল ইহুদি। তার চোখের তারা কটা, গায়ের রঙ খোসছাড়ানো সেদ্ধ আলুর মত ফ্যাঁসফ্যাসে-হলদে।

দিদি জিজ্ঞাসা করত, 'তাহলে পারেকসাহেব?'

'ব্যাটাছেলের গায়ের রঙ ঠিক কালো হবে না।' দেখতে দেখতে আবার অপরাহ্নকাল এসে যেত, মন্দিরের চূড়া থেকে ঠিকরে এসে আলো লাগত মীরাবৌদির মুখেচোখে, বুকে; 'শ্যামল হবে, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ হবে বুঝলি?' নিচু গলায়, যেন গোপন খবর, বৌদি বলত, 'এই যেমন কৃষ্ণের ছিল।'

'কে বাঁশি বাজাচ্ছে রে!' ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াত মীরাবৌদি, তার হাতের চুড়ি বেজে উঠত ঝমঝম করে, 'ও!' আমূল উৎপাটিত গলায় তারপর বলত, 'এই যা। রেডিও আরম্ভ হয়ে গেল? যাই, শনিবার, তোর দাদা এসে পড়বে। কী বই এনেছে রে বিশু-ঠাকুরপো?' বিশেদা লাইব্রেরি থেকে আনত 'রমাহারা মোহন'। মীরাবৌদি নিত জালের গর্ত দিয়ে কনুই অব্দি হাত ঢুকিয়ে।

দু'বার চেষ্টা করে ক্লাস এইট-এ প্রমোশন না পেয়ে লেখা-পড়ার পাট চুকিয়ে দিলে কি হবে, বিশেদার হাতের লেখা ছিল মুক্তোর মত গোটা গোটা। পাড়ার মেয়েমহলে এ-জন্যে বিশেদার চাহিদা ছিল খুবই। সূচের কাজ, পিক্টোগ্রাফ বা আসনের জন্য অনেকেই বিশেদাকে দিয়ে 'পতি পরম গুরু' বা 'জননী জন্মভূমিশ্চ', 'কিছু লয়ে আসে নাই কিছু নাহি লয়ে যাবে', কি 'যে-জন দিবসে মনের হরষে'—এইসব লিখিয়ে নিয়ে যেত। একখণ্ড কালো মখমলের ওপর বিশেদা দিদিকে লিখে দিয়েছিল, 'সোনার হরিণ, তুমি কোন বনেতে থাক?' বিশেদার সঙ্গে মীরাবৌদির কথাবার্তা ছিল না। বৌদি দিদিকে একটা কুঁচি দেওয়া শাদা বেড-কভার পাঠিয়ে দিয়েছিল একদিন। বলেছিল, 'ঠাকুরপোকে বলিস তো একটা কিছু লিখে দিতে।'

বিশেদা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম শুনেছিল। 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি' বা 'দুই বিঘা জমি' পড়েছিল ছেলে-বেলায়, জন্মদিনের সভায় 'পঞ্চনদীর তীরে' বা 'প্রশ্ন' কবিতার আবৃত্তিও কয়েকবার শুনে থাকবে। অথচ কোথা থেকে বা কী-করে কে জানে, মীরাবৌদির শাদা বিছানার চাদরের ওপর, মুক্তোর

মত ঝরঝরে হস্তাক্ষরে বিশেদা বড় বড় হরফে লিখে দিয়েছিল :

যতবার আলো জ্বালাতে যাই
নিভে যায় বারে বারে
আমার জীবনে তোমার আসন
গভীর অন্ধকারে

চাদরটা বহু বছর টিকেছিল, খাটজোড়া বিছানার ওপর সেটা পাতা হত বছরে দু'চারবার, বড়দিনের সময় নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে আমি একবার দেখেছি। ছাদের তারে তার অক্ষরগুলি গ্রীষ্মের রোদে শুকতো, বসন্তের মনোরম বাতাসে দুলে উঠে গাছের পাতার মত উল্টে যেত অক্ষরগুলি। হঠাৎ বৃষ্টি এলে ছাদে ছুটে আসত মীরাবৌদি, প্রবল বৃষ্টির মধ্যে তাকে চাদরটা নামিয়ে নিতে দেখেছি। বৌদির তোরঙ্গের তলায় এই মুহূর্তে মাকড়শা জাল বুনছে, ভিতরে চাদরের পাটের ওপর শুধু 'তোমার আসন' এই অক্ষরদু'টি, বাকিগুলি ভাঁজে ভাঁজে, তার ওপর গ্রুপফোটো, চিঠিপত্র, লাল চেলি কি জয়পুরে-তোলা তার একা বালিকা বয়সের ছবিটা, তোরঙ্গের ভিতরের অন্ধকারে এই দৃশ্য আমি কল্পনা করতে পারি।

গল্প

মীরাবৌদির কথা এই পর্যন্ত লিখে আর সব কিছু মুছে দিয়ে এইমাত্র এমন-একদিনের স্মৃতি ভেসে উঠল, যা আগে মনে পড়ে নি কোনদিন। সেই কোন কিশোরবেলার কথা,

দেখে তখন কিছুই মনে হয় নি, তখুনি সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে থাকব। কিন্তু যেহেতু আমি ছাড়া জীবিত আর কেউ সে-কথা জানে না, যেহেতু কারুকে বলিনি কোনদিন, এতকাল পরে এই প্রকাণ্ড ভেসেওঠার তাই এত বিস্ময়, গোপনতার এমন দারুণ মূল্য। নিজেকে তাই জাতিস্মর মনে হচ্ছে।

সেদিন বাড়িতে কেউ ছিল না। স্কুল থেকে সোজা চলে গিয়েছিলাম মাঠে। এম. এস. পি. সি. এইচ স্কুলের সঙ্গে ফাইনাল ম্যাচ ওয়াকওভার হয়ে গেল, স্কুলের সেরা গোলকিপার আমি বাড়ি ফিরলাম তাড়াতাড়ি। যুদ্ধ থেকে ফিরে বিশেদা একটা মাড়োয়ারি ফার্মে ট্রাক চালাত। একপশলা বৃষ্টিতে ভিজে ট্রাকটা আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে। কী-ভাবে পড়ে গিয়েছে কে জানে, দেখি, কাদামাখা সামনের একটা টায়ার জড়িয়ে সেই পাগলাফুলের ছিন্ন-লতা, যার নাম ক্যাথিফ্লোরা, তার নীলনীল কানপাশার মত ফুলসুদ্দু।

বগলে ফুটবল, হাতে বই, গায়ে লালহলুদ জার্সি, সিঁড়ি দিয়ে শব্দহীন উঠে দরজার একটা পাল্লা ফাঁক করে আমি দেখলাম। দীর্ঘ দালানের শেষে জানালার জাল, জালের ওপাশে বৃষ্টিশেষের ভেসে-ওঠা আলোয় মীরাবৌদি বসে; জালের অনেকগুলি গর্ত কমলালেবুর ছিবড়ে ও পানের পিকে বোজা, বিশেদার সারা গায়ে একটা জাল ছুঁড়ে দিয়ে মীরাবৌদি বসে আছে। কনুই-অব্দি সোনার চুড়ির অভাবে তার নগ্ন হাত জালের গর্ত দিয়ে ঢোকানো, বিশেদা তার লোহারঙের সমর্থ দুই হাতে জলে অঞ্জলি দেবার মত করে মীরাবৌদির কনুই-অব্দি ডানহাতটা ধরে আছে। শীতকাল, বৃষ্টিপাত হয়ে গেছে। মানুষ কাঁপতে ভালবাসে, তবু দু'জনেই সাড়হীন নীরব।

মীরাবৌদির পিছনে প্রকাণ্ড গোলাপের মত সূর্য। সূর্য ঝরে যায়। মূল আলো নেপথ্যে চলে গেলে থাকে তার বিম্ব; দীর্ঘ গাছ, পাখির গা কি জানালার কাচ, সর্বত্র থেকে বিম্বিত হতে হতে অবশেষে লাগে মন্দিরের চূড়ায়, মন্দিরের চূড়া জ্বলে ওঠে। মন্দিরের চূড়া থেকে ঠিকরে বৌদির মুখেচোখে, তার আভা যেন মীরাবৌদির বুকে লেগে আছে। সাজানো গৃহস্থালী তার মনে নেই।

ওরা মুখোমুখি বসে। অন্ধকার হয়ে এলে পাখিরা চ্যাঁচামেচি করে ওঠে। শিশুদের কোলাহল বেড়ে যায়। শাঁখ বেজে ওঠে।

দূর থেকে শব্দ ওঠে। একটা মালগাড়ি আসছে। বৃষ্টিভেজা রেললাইনদু'টি তাদের সমান্তরাল দীর্ঘতা জুড়ে চকচকিয়ে ওঠে, থরথর করে কাঁপছে। মালগাড়িটা আরো কাছে এসে পড়ে। এখন বাড়ি কাঁপছে, রাস্তা কাঁপছে, জানালা ঝনঝন করে বাজছে। ফিসপ্লেটনাটবল্টুপিস্টনের সমবেত ঝনাৎকারের মধ্যে চাকাগুলি দাঁত কামড়ে বসে যাচ্ছে লাইনের ওপর। তেতাল্লিশটা বগির অন্ধকার শোভাযাত্রা তাদের শৃঙ্খলের শব্দ তুলে পিছু হটে।

অবশেষে এঞ্জিনটা যায়। মাথায় রুমাল-বাঁধা নীল হাফ-প্যান্ট ও গেঞ্জি-পরা ড্রাইভার বিধাতার অপূর্ব কারুকার্যময় এঞ্জিনের অভ্যন্তরে গা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে। ইয়ার্ডে ঢোকার সময় এঞ্জিনটা ধীরে ধীরে বাঁক নেয়। ঝক, ঝক, ঝক, ঝক, ঝঝঝঝঝঝঝঝ ঝক্, ঝক, ঝক, ঝক ঝক···ধীর ও উন্মত্ত শব্দের উত্থান ও পতনের মধ্যে অকস্মাৎ ছাদের তারে ঝুলন্ত চাদরটার ওপর হেডলাইটের তীব্র আলো এসে পড়ে।

হাওয়ায় ফেঁপে ওঠে চাদরটা। অক্ষরগুলি আলোর ঢেউ-এ দুলতে থাকে। সিঁড়ির কাছ থেকে দেখলে মনে হয়, যেন 'যতবার আলো' থেকে 'গভীর অন্ধকার' পর্যন্ত একটা কালো পিঁপড়ে বারবার যাতায়াত করছে।

আবার অন্ধকার। বিশেদার নগ্ন হাতের ওপর মীরাবৌদির কনুই-অব্দি নগ্ন হাত, যেন একটা নগ্ন হাতের ওপর আর-একটা নগ্ন হাত। পিছনে চাদরটা উড়তে পত্ পত্ করে। খরখর শব্দ করছে অক্ষরগুলি। অদূরে নিশ্চিত খড়্গের মত লেভেলক্রশিং-এর গেট উঠে যাচ্ছে।

উপসংহার

বাবা বলেছিলেন, 'ও ভোগ করতে পারবে ভেবেছ, ওর বুকে বজ্রাঘাত হবে।' পারেকের বুকে বাজ পড়ে নি, বজ্রাঘাত হয়েছিল পামগাছটার মাথায়। কবর খুঁড়ে খাড়া করা অলৌকিক অবয়বের মত রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, জ্যোৎস্নায় ম্লান হয়ে, পোড়া পামগাছটা আজো দাঁড়িয়ে আছে; শবদেহের ওপর যেমন রোদ, যেমন বৃষ্টি, যেমন জ্যোৎস্না। অমাবস্যার কালো হাওয়ায় তার গলার ভয়ংকর নীল মালাটা দোলে, জোনাকির ঝাঁক এসে তাকে ছেঁকে ধরে যখন।

আজো পারেক দোকানে বেরোয় নিত্য, কিন্তু দোকানের সে কালোবাজারী জৌলুস আর নেই। ফার্নিচার যা আছে সবই ভাঙাচোরা, এখন ধূলায় মলিন। পাখি নেই, কিছু নেই, ফুল নেই। ময়ূরীর খাঁচাটা ভেঙে গেছে কবে, শ্বেতির

দাগে ভর্তি, নূরওয়ালা রোগা মুসলমান সাইকেলের ঘন্টি বাজিয়ে আসে না আর। পারেকের প্রথম পক্ষের ছেলে বাইরে চাকরি নিয়ে চলে গেছে, অনুচ্চারণীয় ভাষায় বাবাকে গালাগালি করবার জন্যে মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে সে বাড়ি ফেরে। রুক্মিনীর বিয়ে হয়ে গেছে। পারেকের কানি ঝি-টা মীরাবৌদির মেয়েদের অসম্ভব মারপিট করে, তারা চিৎকার করে, মারতে মারতে হাঁফিয়ে উঠে ঝি-টা বলে, 'সেই মানুষটা কোন সকালে খাটতে গেছে, তোদের এ্যাট্টুকুন মায়াদয়া নেই র‍্যা,' আমরা এ-বাড়ি থেকে শুনতে পাই। 'মেয়েগুলোর জন্যে খাটতে খাটতে নঙ্ কালো হয়ে গেল মা,' ছাদজোড়া কুমড়ো গাছ ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে এসে জালের ধারে দাঁড়িয়ে সে মাকে বলত। মীরাবৌদির আইবুড়ো মেয়েটা মীরাবৌদির ঢাকাই পরে বিকেলে গা ধুয়ে ছাদে এসে দাঁড়ায়, অসম্ভব বোবা, যেন তার মুখে রুমাল গোঁজা।

তবে তার অনুমান মিথ্যে হয় নি, পরপর সাতটি মেয়ের পর, অষ্টম গর্ভে মীরাবৌদি পুত্রসন্তান প্রসব করেছিল। তার আরো অনুমান সত্য বলে প্রমাণ হয়েছিল। তার ছেলের নাক মেনির মত খাঁদা হয় নি, টিকোলো হয়েছিল। ভ্রূ-দু'টি হয়েছিল টানা-টানা। মীরাবৌদি সত্যিসত্যিই নীল সন্তান প্রসব করেছিল। আজ আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়, ইচ্ছা হলে গা কাঁটা দেয়, যে, তবে মীরাবৌদি কি কোনো দৈববাণী শুনেছিল?

জন্মের কিছু পরে সে মারা যায়। চোখের তারা বড় বড় হয়েছিল কি না, পল্লবগুলি কেমন হয়েছিল, কেমন বা ছিল তার চাহনি, মুহূর্তের জন্যে মীরাবৌদিই হয়ত তা দেখে থাকবে। আমি যখন মা-র সঙ্গে যাই, বৌদির তখনো জ্ঞান ফেরে নি,

তাকে ঘিরে আছে ডাক্তার, ধাই, প্রতিবেশী দু'-একজন ও স্বয়ং পারেক সাহেব। পাশেই মেঝের ওপর, কাঁথার মস্ত বড় পদ্মফুলের ওপর, চোখ বুজে শুয়ে আছে তার নীল ছেলে ; যেন সে গর্ভের আঁধার থেকে বেরোতে চায় নি, যেন তাকে ছিঁড়ে বার করে পদ্মের ওপর আছড়ে ফেলেছে কেউ, নীল হয়ে যেতে যেতে—গলাকাটা যাবার আগে নিশ্চিত খড়্গের দিকে চেয়ে যেমন মানুষের বোধহীনতার মধ্যে আচম্বিতে বোধ জেগে ওঠে, বেদনা-হীন দুঃখে বিদ্যুচ্চমকের মধ্যে সে তার সকল অতীত দেখে নেয়, যেমন ক্ষণপরে তার গলাকাটা মুণ্ড তার বিচ্ছিন্ন ধড়টার দিকে একলহমা ধরে চেয়ে দ্যাখে—তেমনই, নীল হয়ে যেতে যেতে মীরাবৌদির অষ্টমগর্ভে জাত সন্তান কি তার মাতৃমুখ দেখে যেতে পেরেছিল ?

বছরচারেক পরে সকলের অজ্ঞাত কারণে রেলএঞ্জিনের ড্রাইভার বিশেদাকে রেলএঞ্জিনের চাকার নিচে গলা পেতে দিতে হয়েছিল। সেদিন মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল আমার। খুব কাছে এসে গিয়েছে তখন মালগাড়িটা। ঝক, ঝক, ঝক, ঝক, শব্দ উঠছে, ঝক, ঝক, ঝক, তারপর আবার সেই উন্মত্ত, ঝঝঝঝঝঝঝঝ ঝক্, আবার থেমে থেমে, ঝক, ঝক, ঝক··· পাঁচিলের ওপাশে রেলইয়ার্ডের মধ্যে লাইন-পাল্টানোর শব্দ হিশেব করে তেতাল্লিশটা বগি গুনেছিলাম সেদিন, বিছানায় ভয়ে কাঠ হয়ে শুয়ে।

পরদিন মর্নিং-স্কুলে যাবার পথে শুনি রেলবাঁধের ওপর সুইসাইড করেছে একজন লোক। বাঁধে উঠে দেখি, কাঁধের কাছ থেকে কাটা একটা ধড় পড়ে আছে, তাকে ঘিরে একদল অপরিচিত লোক, ঢাল দিয়ে গড়িয়ে পড়েছে কাটা মুণ্ডুটা,

তাকে ঘিরে একদল অপরিচিত লোক, তারা সকলেই নিমগ্নভাবে দাঁড়িয়ে। তখনো পুলিশ আসে নি। বেচু ও আমি বাঁধের ওপর দিয়ে কিছুদূর হেঁটে গিয়ে দেখি, লাইনের ধারে এক জায়গায় কনুই থেকে কাটা একটা নীল হাত পড়ে আছে, সম্ভবত চাকার সঙ্গে আটকে গিয়ে থাকবে। আমি হেঁট হয়ে তা স্পর্শ করতেই, 'এ্যাই বিজন', বেচু চমকে বলে উঠল, 'কী করলি!' আমি বললাম, 'তোকে ছোঁব না। কিন্তু মাকে বলিস না, খবর্দার।' তারপর আমরা দুই বন্ধু রেললাইন ধরে হাঁটতে লাগলাম পূর্বদিকে, পাশাপাশি, বহুদূর। যতদূর যাই, দেখি, মাঝে মাঝে শ্লিপারের ওপর রক্তের ফোঁটা দানা বেঁধে আছে। হয়ত রাতের মালগাড়ির কোনো বগিতে কলকাতার জন্য ছালছাড়ানো ভেড়া কি শূয়ারের মাংস চালান যাচ্ছিল।

কিন্তু সেই স্পর্শ আমার জ্ঞান, সেই স্পর্শের কথা আমার আজো মনে পড়ে, তার স্মৃতি আমার মূলে মূলে আজো শিউরানি জাগায়। যখনই মনে পড়ে, যাই ছুঁয়ে থাকুক আমার হাত, বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত আমি বন্ধুর কাঁধ থেকে হাত তুলে নিই, সরিয়ে নিই বই থেকে, আলমারি থেকে, লোভ, আশা ও তৃপ্তি থেকে। সেই স্পর্শ আমাকে আচ্ছন্ন করে, 'যতবার আলো' থেকে 'গভীর অন্ধকার' পর্যন্ত পংক্তিক'টি আমার চোখের সামনে বারবার প্রতিভাত করে তোলে। ঘৃণির মত তাদের সর্বগ্রাসী মানে আমাকে টানে, আজ আমি বুঝতে পারি অর্থ না জেনে যে পংক্তিক'টি ব্যবহার করে তার অজ্ঞতা, অজ্ঞতার ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

রেলের লাইনে গলা পেতে তার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত

সুদূরের শব্দ নয়, মাত্র এক হাত দূরে এঞ্জিনটা যখন, তখন থেকে গলায় চাকা বসার মুহূর্ত পর্যন্ত বিশেদা কি এঞ্জিনের শব্দ শুনতে পেয়েছিল? পেয়েছিল নিশ্চয়, তবু গলা তুলে নিতে পারে নি! তারপর বিশেদার কাটামুণ্ডু ক্ষণেকের জন্য তার ছিন্ন ধড়ের দিকে চেয়ে ছিল, কী দেখেছিল—কী সেই অজ্ঞাত কারণ, যা রেলএঞ্জিনের ড্রাইভার বিশেদাকে রেল-এঞ্জিনের চাকায় গলা পেতে রাখতে বাধ্য করেছিল, গর্ভের প্রহেলিকার মত ঘিরে ধরে স্পর্শের সেই রোমাঞ্চ আমাকে তা জানায়।

আটমাসের গর্ভবতী অবস্থায় নীল সন্তান প্রসব করে মীরাবৌদি মারা যায়। তার জরায়ুতে ক্যানসার হয়েছিল, সে কারণ নয়। তারপরেও বিশেদা বিয়ে করেছিল, বধূ ছিল, শিশু ছিল, সে কারণ নয়। বস্তুতপক্ষে মীরাবৌদির কোনো অসুখে মৃত্যু হয়নি, এই মৃত্যু ছিল তার একান্ত নিজস্ব মৃত্যু, তার অবধারিত। সন্তানের জন্ম দিয়ে, সন্তানের জন্ম দিতে দিতে, শরীরকে ক্রমাগত কাঁদানোর এ-ছাড়া আর কী শাস্তি হতে পারত তার!

মা যতই বলুন, 'মীরার মত সতী এ যুগে হয় না', যতই বলুন, 'সাক্ষাৎ মীরাবাঈ,' একদিনের বিকেলবেলার স্মৃতি ও একদা-ভোরবেলার কাটা নীল হাতের স্পর্শ থেকে আমি জানি, কী সূক্ষ্মভাবে চরিত্রহীন ছিল মীরাবৌদি, আর সেই অজ্ঞাত শিল্পবোধকে স্পর্শ করার জন্য ব্যাকুল পারেক কী অবর্ণনীয় বোধহীনতায় পাখি পেলেই খাঁচায় পুরে দিত ত্বরিতে, গাছ পেলেই টবে। ফুটপাতে শূ-এর শব্দ তুলে গলির মুখ থেকে জনহীন পারেক তাই হেঁটে আসত মাঝে মাঝে,

মধ্যরাতের বন্ধ দরজার ওপর দুইহাতের মুঠি দিয়ে ঘুসি মারত। কৃপাপ্রার্থী সে, স্খলিত, অস্ফুটস্বরে তাই সে ডাকত, 'দরজা খোলো। দরজা খোলো।'

হতভাগ্য পারেক তাই ৯৪০টা পেরেক-মারা খ্রীষ্টের ছবির পাশ থেকে নামিয়ে নিত তার নির্জীব চাবুক, কোলের মেয়েটাকে বুকের কাছে চেপে ঝি ঘর থেকে বের করে নিয়ে যেত, দরজা-জানালা একে একে বন্ধ হয়ে গেলে পারেকসাহেব তাই মাঝে মাঝে মধ্যরাতে কাফ্রী হয়ে যেত। লেজের কাছ থেকে চেপেধরা জ্যান্ত সাপের মত ঝুলন্ত চাবুক হাতে ঘরের মাঝখানে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে এ-যুগের সতীর মুখোমুখী হত।

ক্রীতদাস ক্রীতদাসী

১

দেখি, দোতলায় দুজনে বসার সিটে একলা বসে আছে। গায়ে শাদা শাল জড়ানো, ব্যাস, আর কিছু মনে নেই। মনে পড়ছে না, ভুলতে পারছি না।

আমি কারো চোখের দিকে আজ পর্যন্ত চাই নি। পরিচিত, অর্ধপরিচিত, অপরিচিত, অনেকের দিকে চেয়ে দেখেছি। কারো কারো ঠোঁট, নিতম্ব, স্তন, কারো বা নগ্ন হাত আমার ভাল লেগেছে। কারো নীরবতা মনে আছে, কারো অভিমান, মনে আছে কোনো হাঁটার ভঙ্গি। একজন গায়িকার গ্রীবা মনে পড়ে। কোন চোখ মনে পড়ে না।

বাসের হ্যাণ্ডেল ধরে মায়ার দিকে চেয়েছিলাম। শীতের এত ভোরে আমি আগে কখনো বেরুইনি। যখন গঙ্গার ওপর বাস উঠল, মনে হচ্ছিল, গঙ্গায় জীবনের ভাসমান শোভা দেখে বাসের মানুষগুলো সকলেই দ্বিরুক্তিহীন, অতিশয় নম্র ও বিনয়ী হয়ে পড়েছে—৮নং বাসের 'লেডিজ ওন্‌লি' আঁটা সিটে মায়া বসেছিল হেঁটমুখে, চোখ নামিয়ে—তাদের চোখ সহসা ছল-ছলিয়ে ওঠে, কেননা, তটভূমি ত্যাগ করে এই সময় একটি

দণ্ডিত জাহাজ, চলে যেতে হবে বলে, কুয়াশার ভিতর দিয়ে তার যাবজ্জীবন নির্বাসনে চলে যায়।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল মায়া, অনেকক্ষণ এক-দৃষ্টিতে চেয়ে থাকার পর সে ক্রমশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল, অবশেষে চোখ তুলে চাইল, চুলে-ঢাকা ডান গালটা একবার ফিরিয়ে-সরিয়ে নিল চকিতে, বাঁ-গালের উড়ন্ত চুল, চাপা কাঁধ ও জাগ্রত কণ্ঠার ফাঁক দিয়ে সেই জাহাজের দূর মাস্তুল দেখা গেল একবার, বাস ব্রিজের উপর উঠছে বেশ বোঝা যাচ্ছিল।

পরমুহূর্তে সে আবার চোখ তুলে চাইল। 'ও!' আমূল চমকে উঠল মায়া। হাসল। একেবারে তৎক্ষণাৎ, শিকড় সরসর করে উঠলে গাছের যেমন হয়, আমার সেইরকম হল। কোনো বাস্তব কারণ নেই, অথচ আমি বুঝতে পারলাম, ওর বহুদিনের গোপনতার সঙ্গে এই হাসি ও স্বরের সম্পর্ক রয়েছে, বিশেষত এই চমকে-ওঠার। সেই তখন থেকে সুরু হল এক আশ্চর্য আত্মহনন, সেই মুহূর্ত থেকে, একেবারে তৎক্ষণাৎ, ওর সঙ্গে মনে-মনে কথা বলার এক আত্মঘাতী অভিজ্ঞতার মধ্যে আমি জড়িয়ে পড়লাম। আর বুঝলাম এই রকম চলবে, এই সুরু হল, যতবার মায়ার সঙ্গে আমার দেখা হবে, এই রকম চলবে। এই আমার নিয়তি।

মায়া বলল, 'আরে আপনি?'

আমি মনে মনে বললাম, 'হ্যাঁ, আমি।' মুখে বললাম, 'চিনতে পেরেছেন?'

মায়া বলল, 'আপনারা ফিরলেন কবে পুরী থেকে?'

আমি মুখে তার উত্তর দিয়ে মনে মনে বললাম, 'আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে।'

'ভালো আছেন ?'

'ভালো।' (বললাম,' শাদা শাল জড়িয়ে বসে আছ, ও-হো, কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে।')

'কোথায় যাচ্ছেন ?' মায়া জিজ্ঞাসা করল। 'ট্যুইশনিতে। আপনি এই ভোরবেলায় ?' 'এই, এদিকে একটু কাজ ছিল।' মায়া প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল কেন ? পরে জানতে পারব। এখুনি জিজ্ঞাসা করে লাভ কী ? কিন্তু আমি কী জন্যে বেরিয়েছিলাম, এই ভোরবেলায় ? 'কোথায় যাবেন জানতে পারলে টিকিটটা কাটি।' 'ধন্যবাদ। আমি একটু দূরে যাব।' আমি দ্বিতীয়বার বললাম না। কী হবে ? আবার তো দেখা হবে। তখন, দু'-এক বছর পরে, ও কোথায় যাবে জানা থাকবে এবং টিকিট কাটার অনুমতি চাইতে হবে না।

হ্যারিসন রোড দিয়ে হাওয়া কেটে বাস যাচ্ছিল। হাওয়ায় হ্যারিসন রোডে একঝাঁক পায়রা উড়ছিল, এই উল্টে গেল, ক্রমশ আরো উপরে উঠে যায়। যেন শৈশবের স্বাধীনতাদিবসে, যখন কুয়াশায় 'মাগো তোমার চরণদু'টি বক্ষে আমার ধরি' এই সঙ্গীত চিত্রে অর্পিত হয়, সভাপতি পতাকা উত্তোলন করছেন নিচে, একটা কালোছিট শুভ্র পতাকা উঠে যাচ্ছে পত্ পত্ করে, উপরে, আরো উচুঁতে। সেই হাওয়া কেটে হ্যারিসন রোড দিয়ে বাস যাচ্ছিল। অকারণে আমার মনে সূর্যোদয়ের জন্য অপেক্ষমান অমূল্য মুগ্ধতা জাগে। পাখি, বা সূর্যাস্তের আলোয় বিলীয়মান নৌকা মনে পড়ে।

জলকুলিতে রাস্তা ভিজিয়ে দিচ্ছে। অনেকেই এখনো ঘুমে অজ্ঞ, কেউ কেউ জেগে উঠে পায়চারি করছে রাস্তায়। সূর্য উঠতে পারে। কী-রকম ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা লাগে, কী রহস্যময় লাগে

জানুআরির এই সব ভোর, তা অনেককেই বলে দিতে হবে না, কারণ অনেকে জানে। অনেকেই বলবে, হ্যারিসন রোডকে হ্যারিসন রোডের দর্পণ বলে মনে হয়। আমি কলেজ স্ট্রিটের একটা টিকিট কেটে, কলেজ স্ট্রিট অব্দি ওর দিকে চেয়ে রইলাম, যার মধ্যে দু'-একবার শাদা শালটা আরো মুড়িশুড়ি দিয়ে বসল ও, ওর কণ্ঠাদুটি জেগে রইল আগের মত, চেষ্টায় থাকার জন্যে কথা ফুরিয়ে গেল না, একবার যখন ও জানালা দিয়ে মুখটা গলিয়ে দিল, আমার মনে হল ওর শুকনো মুখ থেকে ধুলো উড়ে যাচ্ছে হুহু করে—ওর সেই ক্ষণিক অন্যমনস্কতার সময়, কলেজ স্ট্রীটে, ওকে কিছু না বলে আমি টুপ করে বাস থেকে নেমে পড়লাম।

২

আমি কী রকম? ছেলেবেলা থেকেই সুন্দর ছেলেদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। বেচুকে দেখে মা পর্যন্ত বলেছিল, 'আহা কী সুন্দর দেখতে রে তোর বন্ধু!' বেচু জানে ওকে কেমন দেখতে। সব চেয়ে কুৎসিৎ লোকও আমি দেখেছি, আমাদের অফিসের চৌধুরি। প্রথম দিন আমি চেয়ে দেখতে পারিনি। আমাকে চোখ ফিরিয়ে নিতে হয়েছিল। চৌধুরি কি জানে, সে কী কুৎসিৎ! জানার দিকে সাহস করে কিছুদূর এগিয়েছিল সে নিশ্চয়। আমি, আমি জানি, চৌধুরি বা বেচু কারো মতই নই।

আমাকে কেমন দেখতে আমি জানি না। আমার মা নেই,

বাবা সওদাগরী অফিসের স্টেনো ছিলেন বলে আঙুলে বাত নিয়ে রিটায়ার করেছেন। ব্যাঙ্কে, শুনেছি, বাবার টাকা আছে। দাদারা বিবাহিত, সন্তানাদি আছে, চাকরি ব্যবসা ইত্যাদিতে উপার্জন করেন। মেজদা কোনোদিন খবরের কাগজের বেতার-বার্তা পড়েন না, তবে অফিসফেরৎ, ট্যুইশন সেরে, নিত্য বাড়ি ফিরে প্রথমেই রেডিওর চাবি টিপে দেন। একটা-কিছু গানবাজনা হোক বা কথাবার্তা, তিনি শুনতে চান। সে-সময় রেডিওতে তা হয়ও। এক-একদিন দেরি হয়ে গেলে অবশ্য, তখন রেডিও খুললে একটা একটানা কুঁই-কুঁই আওয়াজ বেরোয়। বড়দা এত উত্তেজিতভাবে ভাত খায় যে, দেড়তলায় আমার এই গর্তের মত ঘরটায় শুয়ে তার হুশ্ হাশ্ শব্দ শুনতে পাই। আমাদের বাড়িতে একটাই হাঁড়ি চড়ে। আমি কিছু লেখাপড়া শিখে চাকরি করি। আরো ভাল একটা চাকরি পাব, জামাইবাবু ব্যবস্থা করেছেন দিল্লিতে, শুনেছি তখন আমাদের বাজার-খরচা দৈনিক আট-আনা হিশাবে বাড়ানো হবে। ততদিনে, নিয়ম-মাফিক হলে, বৌদিদের দুটি-তিনটি ছেলেপিলে হবে।

৩

ঈশ্বর ধন্যবাদার্হ যে, ইতিমধ্যে যে-দুদিন মায়ার সঙ্গে দেখা হল, তার প্রথম দিন দাড়ি কামানো ছিল। জামাকাপড়ও ভাল ছিল। দ্বিতীয় দিন পোষাক ছিল শ্যাবি, কিন্তু দাড়ি কামানো ছিল। আরো একদিন দূর থেকে দেখেছিলাম।

সন্তোষ গোঁফটা অত্যন্ত সরু, ছোট-বড় আর ছুঁচলো করে কেটে দিয়েছে সন্দেহ হওয়ায়, (সন্দেহ, কারণ ওর সেলুনের আর্শিটা এত পারাওঠা, উঁচু-উঁচু আর এমন ব্যঙ্গ করে) আমি ওর কাছে যাবার ইচ্ছে থেকে দ্রুত সরে গিয়েছিলাম। যা হোক, এখন মাসের শেষ, তবুও শুধু ওর সঙ্গে দেখা করার জন্যে একটা খদ্দরের পাঞ্জাবি করতে দিয়েছি। ধুতি এবং সেটা ডাইংক্লিনিঙে দিয়ে, কেচে আসার পর, ওর সঙ্গে পরপর দু-তিনদিন দেখা করার চেষ্টা করলে, ধুতিপাঞ্জাবি ময়লা হবার আগে ওর সঙ্গে একদিন দেখা হবে বলে মনে হয়। আর গোপালবাবু খুব আন্তরিকভাবেই অনুরোধ করেছেন, 'যেদিন মায়ার কাছে যাবে, ভাল জামা-কাপড় পরে যেও, আর চুলটা যেন আঁচড়ে যেও ঠিকমত।' চুলটা যদি অল্প শ্যাম্পু করি, আমাকে কেমন দেখায় ?

৪

আজ রাত আটটা নাগাদ তিন আনায় আমি আর সুরেশ্বর দুজনে টিফিন করলাম খাস চৌরঙ্গিতে, খিদিরপুরের প্রাইভেট বাসগুলো যেখানে দাঁড়ায়, সেইখানে। জল আর পেট্রলে থক থক করছে জায়গাটা। একজন পাঞ্জাবী সিলিং পর্যন্ত জালে-মোড়া টিকিট ঘরটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, কেউ কেউ ব্যাগ কাঁধে ঘোরাঘুরি করছে, তাদের ঘামের গন্ধ, সারি সারি লাল শালুর ওপর পাতা পান-সিগারেট, গরম আলুকাবলি, স্তূপাকার ফুচকা, ভাঁড়-ভাঁড় তেঁতুলের ঝোল—স্থান জুড়ে এখানে একটা টক্‌চা

গন্ধ। প্রায় পনের কি কুড়িটা বাস হা হা করছে ফাঁকা, একটা বাসে কিছু যাত্রী উঠেছে, মোমিনপুর যাবে, কখন ছাড়বে ঠিক নেই, কিছুই ঠিক নেই!

অদূরে প্রোথিত মনুমেণ্ট। আরো দূরে কলকাতার লাল-নীল ক্ষত দগ্ দগ্ করে জ্বলছে। বেদুইন যুবতী ঘুরছে দামী শাটিনের শালোয়ার পরে, ছেলেটাকে বুকের কাছে শুইয়ে, পাশে বৃদ্ধা, পিছনে উৎসাহী কুকুর। আরো পিছনে কলকাতার একমাঠ প্রয়োজনীয় অন্ধকার।

দুআনার মুড়িমশলা খেলাম দুজনে। কত সুন্দর এই মুড়িঅলা, দুগাল মুখে দিয়েই তা বোঝা গেল। ঝাল-পেঁয়াজ-আদা দিয়েছে, তেল দিয়েছে, সবুজ ও লাল লঙ্কার টুকরো আর ঠিকমত নুন দেওয়ায় বিশেষত স্বাদু। চাঅলাকে বললাম, 'দু-ভাঁড়ে দু-পয়সা করে চা দাও ভাই।' চাঅলা, আশ্চর্য, দিল। খুরি ভর্তি করেই দিল, আমাদের দুর্বল আপত্তি অগ্রাহ্য করে দিল। সুরেশ্বর জিজ্ঞাসা করল, 'ইজ ইট্ চ্যারিটি বিজন?' আমি বললাম, 'চারটে মোটে পয়সা দিলাম, দুটো খুরির দামই দু-পয়সা। তার ওপর দু-আনার চা তুমি দিলে, আর এমন সুন্দর চা। তোমার যে লোকসান হল হে! কেন তুমি এমন ভুল করলে?' চাঅলা সংক্ষেপে বলল, 'কোই বাত নেই বাবু।' আমি ওকে একটা চার্মিনার দিলাম। কী লজ্জা চাঅলার! বসে ছিল, ডান হাতটা সিগারেটসুদ্দু নমস্কারের ভঙ্গিতে তুলে, বাঁ-হাতের ওপর মাথাটা রেখে মুখ লুকিয়ে এক ধরণের হাসতে লাগল। কীসে যে ওর অমন নারীসুলভ সুন্দর লজ্জা হল, বুঝলাম না।

তারপর মনুমেণ্ট অবধি হেঁটে গিয়ে, মনুমেণ্টের নিচের

সিঁড়িতে আমি বসলাম, সুরেশ্বর বসল সবচেয়ে ওপরের ধাপে। শীত এলে একাকীত্ব বড় কষ্ট দেয়। কুয়াশায় স্পষ্টত দেখা যায় না কিছুই।

চেঁচিয়ে বললাম, 'ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স নিয়ে, বুঝলি সুরেশ্বর, বেশ উপকার হয়েছে। মন কী শান্ত, বেশ সাফসুফ লাগছে শরীর।' সুরেশ্বর তো হ্যা হ্যা করে হেসে উঠতে পারত, ট্রামে ওঠার আগে ও কেন বলল, 'এমন গভীর ভালবাসা তোর। এমন গভীরতায় যার সুরু, তা কেন ভেসে উঠবে? ওকে তুই পাবি না, দেখিস।'

সমুদ্র থেকে হাওয়া বহু দূর দেশ অবধি যায়। আমি তার থেকেও দূরে। হু হু করে এত হাওয়া লাগে কেন।

৫

'কোন অফিসে না শুনলেন। ধরুন, ওই—ওই দিকের একটা অফিস। আপনি তো ডালহৌসিতে যান?' বলে তৎক্ষণাৎ পরে মায়া বলল, 'চলুন, ওই ব্যালকনির নিচে দাঁড়াই।' সম্মতিসূচক যা বলার বলে, আমি ওর স্বর যেদিক থেকে আসছিল সেই দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আসুক না বৃষ্টি, ভেজো না তুমি, বৃষ্টিতে? বৃষ্টি থামার পর জলের ফোঁটা ও তার লম্বা ছায়া পড়ে বিন্দু-বিন্দু তোমার মুখ কেমন হয়, সেও তো দেখার।' ব্যালকনির নিচে দাঁড়িয়ে মায়া বলল, 'ও বাবা, এ যে ঝমঝমিয়ে এল। ইশ্, লেট না হয়ে যায় আবার।' 'বিকেলের আগে থামছে না।' হেসে বললাম। 'ইশ্! কক্ষনো

না।' হেসে বলল। মুখ শুকনো করে বলল, 'আমাদের বড়বাবু, বুঝলেন—' 'আমাদেরও বড়বাবু'—মুখ শুকনো করে বললাম।

প্রতিমার কল্কার মত ওর কানদুটি কেঁপে উঠল কি, যখন আমার হাতের ছায়া ওর মুখটা দু-হাতে ধরে, একবার এই কানে, একবার অন্য কানে মুখ রেখে অনেকবার বলল, 'কখনো দেখিনি। হয়ত চন্দনের ফোঁটা-মাখা কনের মুখের মত হয়।'

'আপনার মা-বাবা আছেন?'

'তোমার হাতটা ধরব?'

'কেউ নেই!'

'না।'

'ভাই?'

'একজন যমজ ভাই। হ্যাঁ, একসঙ্গেই থাকি। না, সে কিছু করে না, শুয়ে-বসে থাকে, হাই তোলে।'

চিক্কন রাস্তা ধরে মেঘ এগিয়ে আসছে। হঠাৎ একটা হাওয়ার ঝাপটায় গোটা রাস্তা জুড়ে দুলে উঠল। রাস্তার মোড়ে আরো মেঘ। স্বপ্নাহতের মত আমি আবার বললাম, 'হয়ত কনের মুখের মত হয়। তাই, ভেজো না তুমি বৃষ্টিতে, ভিজবে?' মায়া বলল 'বৃষ্টি থেমে এল, চলি। আপনার তো ছাতা আছে?'

মাঝে মাঝে ভ্রম হয় ও বড় বেশি কুৎসিত, কিন্তু ওষ্ঠের সামান্য প্রয়াসে পরমুহূর্তেই সে কেমন অপরূপ সুন্দরী হয়ে ওঠে! চোখের পাতা নেই, বৃষ্টিকণায় ঝাপসা চশমার কাঁচের ওপর ওর চোখের চাওয়া, আসলে কি

কাছ থেকে, পাশ থেকে ওকে এমন সুন্দরী দেখায়?

দু-পা এগোতেই একটা ট্রাম এসে পড়ে, আমরা দাঁড়িয়ে পড়ি। ছুটন্ত ট্রামে লহমায় লহমায় মুখ, বৃষ্টির ছাট এসে পায়ে পড়ছে আমাদের দুজনেরই, কী সামান্য দূরে কাঁপছে ওর ওষ্ঠ, সামান্য দূরে ওর অধর স্থির, চূর্ণ হবার মুহূর্ত পর্যন্ত ফেঁপে উঠে গম্ভীর জলস্তম্ভের মত আমার শরীর সেই মুহূর্তে ওর ঠোঁটদুটির উপর আছড়ে পড়তে চায়।

ট্রাম চলে গেছে। বৃষ্টি ধীরে ধীরে থামল। একই ছাতার নিচে আমরা দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। টপ্ করে একটা ফোঁটা পড়ল ছাতার ওপর। মানুষের ঠোঁট অত শুকনো হয়?

আদর-করা গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, 'পুরীতে আগে গিয়েছিলেন নাকি?' যেন ফের, 'অত শুকনো কেন তোমার ঠোঁট,' জিজ্ঞাসা করছি।

মায়া উত্তর দেবার জন্যে মুখ তুলতেই, চকিতে আমি: বোধ হয় কাউকে চুমু খাওনি বলে, না?

মায়া: না, পুরীতে ওই একবার।

আমি: আচ্ছা জলে চুমু খাওনি, বিকেলে, যখন গা ধোও?

'হ্যাঁ', ঘাড় হেঁট করে মায়া বলল, 'কোনারকে গিয়েছিলাম।'

আমাকে একেবারে অন্যরকম দেখতে ছিল। আমি আপার-ডিভিশন ক্লার্ক, ভাই-এরা একসঙ্গে আছি, সংসারে অল্প টাকা দিতে হয় বলে আমার হাতে কিছু টাকা থাকে। আমার এখন একটিমাত্র ধুতি রয়েছে অথচ জামা পাঁচ-ছটি বলে, উদ্বৃত্ত জামার সমস্যায় আমি অত্যন্ত অসহায়, বিব্রত ও বিরক্ত বোধ করি।

আমি দিদিমাকে 'মা' বলে ডাকি। দিদিমা দেওয়াল ধরে পাশ দিয়ে চলাফেরা করে, মাঝে মাঝে বলে, 'এই, তুই আমার কাগজপত্রগুলো দেখবি?' মাকে আমি সম্পূর্ণ ভুলতে পারিনি, মাকে আমার একমাস কি দু'মাস অন্তর মনে পড়ে।

যে পেনটায় লিখছি, এটা দিয়ে ভকভক করে কালি বেরোয়। ভকভক করে এ ছাড়া যা যা বেরোয় সবই ঘৃণা করি, যেমন মানুষের সেন্টিমেন্ট। যা হোক, ক্যাপ খুলে আমি মশারিতে কালি মুছলাম, রোজই মুছি। এ কথা ভাবতে ভাবতেই মুছি যে, মশারিটা আমার বিধবা দিদি পরশুদিন সোডা-সাবান দিয়ে কেচে খুবই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। পেটে একটা ছেলে থাকলে কি হবে, বৌদিকে আবার দু চারদিন পরেই এটা কাচতে বলতে হবে। এইমাত্র আমি জানালার জালের গায়ে থুতু ফেললাম, গয়েরও ফেলি। কমলালেবুর ছিবড়ে ও শুকনো গয়ের-এ জালের অনেকগুলি গর্ত বুজে গেছে, ফলে আমার শাদা চাদরখানা, রোদ পড়লে, লাল-কালোর একটা সতরঞ্চি হয়ে থাকে। বিকেলের কথায় মনে পড়ল, সন্ধ্যার আগে আমার রোজ মাথা ধরে, আমি সারাদিন দুর্বোধ্য চার্মিনার খাই।

বছরখানেক আগে প্রথম বর্ষার দিনে একবার আমি বাড়ি ছিলাম। বিকেলে মেজদার বাচ্চা টুটুকে নিয়ে গেলাম ছাদে, ও ছুটে বৃষ্টির মধ্যে চলে গেল, ছাদে গড়াগড়ি খেতে লাগল—দেখে, আমি ওকে ভালবেসে ফেললাম। একটি শিশুকে ভালবাসতে পারি, দেখলাম। কিছু পরে ওর গা-হাত মুছিয়ে দিলে, টুটু পকেট থেকে একটা লাল বেলুন বের করে বহুকষ্টে ও দীপ্তমুখে তা ফোলাবার পর, মনে আছে, একটা ছোট্ট পিন দিয়ে আমি তা ফুটো করে দিয়েছিলাম।

আমি শেষ পর্যন্ত ভালবাসতে পারতাম না কোন কিছুই, আবার কাউকে খুন করার ইচ্ছেও আমার কোনদিন হয় নি। রাগ, ঈর্ষা, অভিমান—এসব কিছুই আমার হত না। পৃথিবী ও মানুষকে আমার মনে হত একটা ছিবড়ে, কালক্রমে নিঙড়ে নিঙড়ে অভিজ্ঞতা যার থেকে সবই নিয়ে নিয়েছে।

বন্ধুরা পটাপট প্রেম করলে আমার ঈর্ষা হয়েছে বলে মনে করতাম শুধু এই ভেবে যে, তা করে একটা প্রকারান্তর যৌনতা তারা পায়। প্রেম করার নামে প্রায় সকল বন্ধুর জিভ দিয়ে জল-পড়া এমন যে, যে-কোন বুদ্ধিমান দালাল একটি আস্ত নপুংসককে ঠিকমত মেকআপ দিয়ে তাদের মানসী করে দিতে পারে। উদ্দেশ্য মহৎ, নারীর প্রেম, তবুও পা-টিপে পা-টিপে সেদিকে এগনো কি উচিত? কিন্তু কে শোনে কার কথা! কোন স্মৃতি নেই, বিস্মৃতি তো পরের কথা, আমার যুবক-বন্ধুদের লোভ ছাড়া কোন ঔদাসীন্য নেই দেখে আমার মনস্তাপ ছিল।

কেননা, প্রেম হয়, কেউ করে কি? অন্তত প্রেম করার জন্য আমি কখনো কোন মেয়েকে অনুসরণ করিনি।

আমি বরং গণিকালয়ে গেছি। প্রেমহীন দেহ ভোগ করতে গিয়ে আমি বিফল হয়েছি সত্য, তবু আমি চরম পাপ করিনি। আমি কখনো ও কিছুতেই কোন গণিকার ওষ্ঠচুম্বন করিনি।

আমি প্রায় সব কিছুকেই মিথ্যে ও ভুল বলে জানতে শিখেছি। সবচেয়ে বেশি ভুল ও সন্দেহজনক মনে করেছি আমার আন্তরিকতাকে। তবুও কোন ভোর ভাল লাগলে, পৃথিবীর বিখ্যাত স্তিনারিগুলির অন্যতম গড়ের পিছনের সূর্যাস্ত দেখে মুগ্ধ হলে, আমি কাঁধে হাত রেখেছি নিজের, 'সত্যি তো, নাকি বই পড়ে শিখেছ?' জিজ্ঞাসা করেছি, 'বা, এইরকম প্রচলিত বলে ভাল লাগছে?' ভাল-খারাপ মিশিয়ে ভীষণ জটিল ব্যাপার খুলে দেখতে গিয়ে বিস্মিত হয়ে জানতে চেয়েছি, 'একি প্রকৃত বিস্ময়, না ভান?' দুঃখের ফেরানো মুখরেখা আদরে বারবার আমার দিকে ফিরিয়ে বলেছি, 'দুঃখ, তুমিও কি মিথ্যা!'

প্রেমে পড়ে আমি এই দেখলাম, গ্রন্থকে বিশ্বাস করে পড়ে গেলে যেমন, প্রেম সে-রকম উচ্ছ্বসিত কিছুই নয়। প্রেম, এমন কি, একটা আবেগহীন ব্যাপার, ক্ষণিকের সুনিদ্রার পর এ যেন আগের মতই সব ঠিকঠাক দেখা। আমার এক বন্ধুর মা যেমন হাসেন, প্রেম সেইরকম—হোয়াইট লাফ্‌টার, আমি পড়েছিও একটা গ্রন্থে। ভালবাসা, আমি ভালবাসতে গিয়ে দেখেছি, শুধু ভালবাসার বাইরেই নয়, সমস্ত মানবিক মূল্য-বোধের বাইরে আমাকে ঠেলে দিচ্ছে।

৭

'মাস দুয়েকের ছুটি নিচ্ছি, এখানে কিন্তু আর দেখা হবে না।' 'কমাসের?' 'দুমাসের।' ('অসম্ভব। না-না—') 'ঠিকানা মনে থাকবে তো,' মায়া বলল, 'গেছেন ওদিকে?'

প্রাণপণে মনে রাখার চেষ্টা করছি কেন? একে কি মনে রাখা বলে, এ তো ভুলে-যাবার বিরুদ্ধে সতর্কতা, একাগ্রতা। কারণ, দ্রুত-ভুলে-যাওয়া একে ছেঁকে ধরছে নিঃশব্দে। কী বলল, ৪।২এ, না-না, ৪।২।২, না, শশী সুর—না-না—

('না-না। তুমি কিছুতেই আমার চোখের দিকে চাইবে না, মুখের ওপর চাউনি ফেলে রেখে ফাঁকি দেবে, সে হবে না।')

'কখন যাব বলুন তো?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম। 'সন্ধ্যের পর আসবেন। বাবার সঙ্গেও দেখা হবে।' 'সামনের সপ্তাহে যাব?' 'ঠিকানা মনে আছে তো!' আছে কি? পরে মনে করে দেখলে বুঝতে পারব। বললাম, 'আছে।'

'ও!' আবার সেই আমূল চমকে-ওঠা, 'বাস আসছে। কটা বাজল দেখুন তো?'

পাঞ্জাবির হাতা সরাতেই ওর মুখ আশাময় উজ্জ্বল হয়ে উঠল কেন? আমার ঘড়ি আছে এই দেখে? ওর অনুমান সত্য এই জেনে? ওর কাছে একটা পেন্সিল আছে, অকারণে এই বিশ্বাস আমার মধ্যে জন্মাল, বদ্ধমূল হল। থাকবে না বা কেন!

'আপনার পেন্সিলটা দিন তো?'

'কী!'

'নেই?'

মাথা নিচু করতে বাধ্য হল। পেন্সিলটা ব্যাগ থেকে

বার করল। কলের পেন্সিল, পিছনটা ঘোরাতে শিষ বেরুল, 'চার-এর দুই-এর—?' মায়া হেসে ফেলল, 'ওম্মা! ও কীসের ওপর লিখছেন?' ও হাসছে। মুখে রুমাল চাপা দিয়ে কুলকুল করে হাসছে। হাসিটা আমার পক্ষে ভাল কি? আমাকে কি অসহায় দেখাচ্ছে? দাড়ি কাটা থাকলে আরো শীত-শীত লাগত। ও কি আমাকে বাঙাল ভাবছে? ও নিশ্চয়ই ভাবছে, এর আগে কোনো মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি। বললাম, 'আমার কাছে কাগজ নেই।' 'তাবলে নোটের জলছাপের ওপর?' কেবল ঠোঁটে হাসিটুকু রেখে দিয়ে মায়া বলল।

'আপনার কাছে কাগজ আছে কি?'

'না হয় নেই,' কৌতুকে অস্থির হয়ে উঠে মায়া বলল, 'বেশ বাবা, ওতেই লিখুন।'

ছানার জলের মত নীল কুয়াশায় শ্যামবাজার ডুবে রয়েছে এখনো। বেলগাছিয়ার দিকটা দেখা যায় না, দূরে রেল-ব্রিজের ওপর থেকে একটা কালোরঙের পুলিশভ্যান নেমে আসছে নিঃশব্দে। কুয়াশা বাসটাকে কত মন্থর ও ফিকে করে দিয়েছে, দূরত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে অনেকটা। গাড়িটা সোজা আসছিল এইদিকে, আমাদের কাছে পেঁছে অকস্মাৎ চাপা গর্জন করে ওঠে, কেননা ঢাকা-গাড়ির ভিতর থেকে এই সময় কয়েদীদের সমবেত জয়ধ্বনি শোনা যায়—কারণ, সম্ভবত, আর. জি. কর হাসপাতালের পিছনে এই মাত্র সূর্য উঠেছে। দূরে রশ্মিরেখা দিয়ে সাজানো রেলওয়ে ব্রিজ মূর্তিমান ধাঁধার মত দাঁড়িয়ে।

'চার-এর—?'

চোখ নাচিয়ে মায়া বলল, 'এর মধ্যেই?'

'মাস খানেকের ছুটি নিচ্ছি।' অন্যমনস্ক গলায় বলল কি? ও বলল, 'এখানে আর দেখা হবে না।' 'কেন' জিজ্ঞাসা করার বদলে আমি বিষাদ খুঁজছি দেখে, যেন-বা ওর বিস্রস্ততার ফাঁক দিয়ে-স্তন দেখা যাচ্ছিল, এমনি ভাবে হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠে মায়া বলল, 'ও কী! নিন, লিখুন চটপট।'

'চলি!' পাগলাটে গলায় বলল।

আবার জয়ধ্বনি! কুয়াশার ভিতর সম্পূর্ণ মিলিয়ে যেতে যেতে রূপার ছিপ্‌টির মত ওয়ারলেশ-ষ্টিক বার বার চকচকিয়ে ওঠে।

ফুটবোর্ডে পা রাখতে ভিড় ওকে গ্রাস করল। মায়া জানালার ধারে বসল। ডান গাল চুলে ঢাকা, কানে গাঁথা সোনার যুঁই। হঠাৎ খুব ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। শীতে আমার ঠোঁট ফেটে যাচ্ছে। মায়া হাত ঢুকিয়ে নিচ্ছে শাদা শালের ভিতর।

'না-না, শার্শিটা তো কুয়াশায় ঝাপসা, আমি তোমার খোঁপায়-রাখা হাত দেখছি, এ তুমি সরিয়ে নেবে কেন?' আমি বলি, অথচ আমাকে মুখ খুলতে হয় না, ঠোঁট ব্যবহার করতে হয় না। গাড়ি ষ্টার্ট নেবার আগে যাবার বেলা পিছু ডেকে বললাম, 'তোমাকে একটা কারুকার্য-করা রুমাল কিনে দেব একদিন।'

আমি এসপ্ল্যানেডের একটা ট্রাম ধরলাম। ভুল ট্রামে উঠেছি, এটা গ্রে-ষ্ট্রিট-চিৎপুর দিয়ে অনেক ঘুরে যাবে, তা যাক। আমার অফিস যেতে দেরি হয়েই গেছে। ক'দিনই মাঝে মাঝে হচ্ছে, আজও যেতে যেতে বৃষ্টি নামল। গণেশ টকির কাছে পৌঁছে, ঢঙ্‌ ঢঙ্‌ ঢঙ্‌ ঢঙ্‌ করে একটা পাগলাঘন্টির আওয়াজে

চমকে উঠেছিলাম। দমকল, মনে হল। বৃষ্টির মধ্যে আগুন লাগল কোথায়! ছুটে গিয়ে ট্রাম থামল ঠিক একটা মন্দিরের সামনে। মন্দিরে আরতি হচ্ছে। এমন অশুভ মনে হয়েছিল মন্দিরের সেই আরতি!

কণ্ডাকটর টিকিট চাইল। আমি আমার লম্বা হাতটা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরলাম।

'খুচ্‌রা নেহি?'

'খুচরা!'

কণ্ডাকটর নোটটার বদলে বহু খুচরো আমাকে দিল। খুচরোয় আমার দু-পকেট ভারি ও ভর্তি হয়ে গেল।

৮

আমি কর্পোরেশনে গিয়েছিলাম। পরিচিত বন্ধু রেকর্ড দেখাল। রাস্তাটা কি শশী সুর লেন বলেছিল, না বাই-লেন? লেন হলে ৪/২/২এ, না ৪/২এ, নাকি শুধু ৪/২? ৪/২এ আছে লেনে, ৪/২ ও ৪/২এ আছে বাই-লেনে। প্রতিটি ভাড়াটের নাম লেখা আছে রেকর্ডে। পদবী জানি, মিত্র। পাঁচজন মিত্র ওই তিনটি বাড়িতে আছে।

লেনে কি বাই-লেনে, ৪/২/২এ নেই কোথাও! না থাক, কিন্তু কী করে অতগুলি বাড়ি হানা দেব, বিশেষত একটি মেয়ের নাম ধরে কতগুলি দরজায় ঘা দিয়ে ডাকব?

কোন অফিসে চাকরি করত, তাও জানি না।

অথচ ওর ঠিকানা ভুলে গেলাম, কোন গেঁথে নিইনি মনে।

কী করব, ওর সামনে যতবারই দাঁড়িয়েছি, বেকুবের মত হতবুদ্ধি, চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছে আমার। প্রতিবারই ও ভেবেছে, আমি নিশ্চিত বাঙাল এবং এর আগে কোনো মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি। নিঃসঙ্গের মত বিস্মৃতি আমাকে ছেঁকে ধরেছে, ওর সামনে দাঁড়ালেই! এই কারণে যে, কারণও ভেবে দেখেছি, ওর সম্পর্কে আমার একটা গোপনতা রয়েছে। ওর কী, ওর তো কোনো সিক্রেট ছিল না।

আমি কি অভিশপ্ত নাকি, যে নোটটা কণ্ডাকটরকে দিয়ে দিলাম। কেন আমার কাছে খুচরো ছিল না! আমি তো জাতিস্মর নই যে, ওর ঠিকানা আমার মনে থাকবে।

৯

বছরদশেক আগে ছেলেবেলায় সন্ধ্যার ধ্বনি ছিল শাঁখে।

ছেলেবেলার কথায় মনে পড়ল, বছরদশেক আগেও আমার বয়স তখন ষোলো, ফার্ষ্ট-ইয়ারে পড়ছি, প্রথম দিন হাফপ্যান্ট পরে গিয়েছিলাম এমন বোকা, আসলে আমার ভুল ধারণা ছিল যে, ছেলেবেলাটা বোধহয় বেশি দূরে ফেলে আসিনি, আজ ধরা পড়ে শুধরে গেল। কিন্তু সে যাই হোক, মনে পড়ে ছেলেবেলায় সরস্বতী পূজোর দিন খুকু যেদিন প্রথম শাড়ি পড়ল হলুদে-ছোপানো, সেই দিনই ওকে বললাম, 'এই আমায় বিয়ে করবি,' ও বলল, 'তোর মায়ের সব গয়নাগুলো দিবি,' আমি বললাম, 'দাও না মা।' মা আমার গা চাটত, বলত, 'স্কুলে পড়া পারিসনি তো?' বলত, 'দুটো পয়সা দোব, বুড়ির চুল

কিনবি ?' বলেছিল, 'কাউকে বলিসনি যেন তোর বাবা আমাকে মেরেছে, বলবি, ছড়ে গেছি, পুড়ে গেছি, বুঝলি ?'

বলত, 'তুই এবার ফার্ষ্ট হবি।'

ছেলেবেলায় সন্ধ্যার ধ্বনি ছিল শাঁখে। ভূমিকম্প না হলে কেউ কি আর শাঁখ বাজাবে না ?

১০

সেই সকালে অফিস যাবার জন্যে বেরিয়ে আজ আর বাস থেকে নামলাম না। তারপর অনেক রাত পর্যন্ত বাসে-বাসেই ঘুরে বেড়ালাম। একবার এ-বাসে উঠি, একবার ও-বাসে। সারা কলকাতার কত রাস্তায় কতবার যে ঘুরলাম।

লাস্ট বাসে একটা ঘটনা ঘটল। বিরক্তি, ক্লান্তি বা শূন্যতা হয়ে বসে আছি এক কোণে, হঠাৎ ফুলের গন্ধ ঘ্রাণে এল। কী ফুল ! একবার মনে করার চেষ্টা করে মনে পড়ল না দেখে, আর সে চেষ্টা করলাম না। তারপর একটা কটু গন্ধ পেলাম, তামাকের। তামাকের গন্ধ বাসে উঠতেই, ফুলের গন্ধ বাস থেকে নেমে গেল। কিছুতেই দুটো গন্ধ মিশল না।

কিছুক্ষণ পরে শুধু ফুলের গন্ধ পেলাম। চেনা ফুল। এক ভদ্রমহিলা, বছর তিরিশ, পাতলা গড়ন, কিশোরী মেয়ের মত ছোট ছোট স্তন, শরীর ধ্বসে যায়নি বহু বছরের দাম্পত্য সত্ত্বেও, দেখে আমি প্রীত হয়েছিলাম। ভদ্রমহিলা স্বামীকে নিচুগলায় কী বললেন, তারপর আঁচলের গিঁট খুলে ফুলঅলার কাছ থেকে কিনলেন ফুলের মালা।

অশ্লীল, অশ্লীল। সমস্ত ব্যাপারটা কী যে অশ্লীল লাগল আমার! বাসসুদ্দু লোকের সামনে ফুলের মালা কেনা, পাশে প্রচলিত চেহারার স্বামী, ধরা যাক প্রেমিক-স্বামী, (তাহলে তো চূড়ান্ত অসভ্যতা!) এর চেয়ে অশ্লীল আগে কিছু দেখেছি কি? অনায়াসে নির্জনে ও একা ফুলের মালাটা কিনতে পারতেন, বাসে গন্ধ পর্যন্ত লুকিয়ে নিয়ে যেতে পারলে আরো শোভন হত।

এই বিন্‌বিনে ঘাম, পেট্রলের গন্ধ, চোখ, সর্দিকাশি, কণ্ডাকটরের চিৎকার—প্রকাশ্য আলোয় এই ফুলমালা কেনা দেখে, পট্ পট্ করে ব্লাউজের বোতাম খোলার মত তাদের শোবার ঘরের মধ্যরাতের জানালাগুলি আমার চোখের সামনে খুলে গেল।

১১

দেওয়ালে ক্যালেণ্ডারে ঈশ্বরের ছবি ঝুলছে। মঙ্গলবারের নিচে রয়েছে পাঁচটা তারিখ—১, ৮, ১৫, ২২, ২৯। কোনো-এক ৮ই মঙ্গলবার ও ৯ই বুধবার একথা ক্যালেণ্ডারে রয়েছে। কিন্তু এই যে আজ, আজকের এই দিনটা, আজ মঙ্গলবার না বুধবার, ৮ই না ৯ই, তা বোঝার কী উপায়? মানুষ কি এমন কোনো উপায় আবিষ্কার করেছে, যাতে আজ, এই আজকের দিনটা, ৮ই না ৯ই, মঙ্গলবার না বুধবার, একথা নিশ্চিতপক্ষে বলা যায়? যদি ধরেই নেওয়া যায় এটা মার্চ মাস, ১৯৬০ সাল, তাহলে ক্যালেণ্ডার থেকে এটা অবশ্য যথেষ্টই

স্পষ্ট যে আজ ৮ই হলে, হলে তবে, মঙ্গলবার, ৯ই হলে যেমন বুধবার। এবং উল্টোদিক থেকে আজ যদি মঙ্গলবার হয়, হলে ৮ই নিশ্চিত, বুধবার হলে অনস্বীকার্য ৯ই। কিন্তু আসলে আজ মঙ্গলবার না বুধবার, ৮ই না ৯ই?

১২

আমাদের আদিকবিতার প্রথম বাক্য সুরু হয়েছিল 'না' দিয়ে।

জানিনা কখন আসবে, ঘুম আসছে না। প্রায় মাসদুয়েক আমার ঘুম হচ্ছে না। দিনে সারা শরীরে ঘুম নিয়ে ঘুরে বেড়াই। অফিসে যাই, জেগে কাজও করি, আজকাল হঠাৎ ওজন দেখা সুরু করেছি। অফিসের পর একটা রেস্তরাঁয় বসে পুনরায় অপরাহ্নকাল এসে যায়, নরনারীর নতমুখ শোভাযাত্রা দেখি কোনদিন, চোদ্দতলা অট্টালিকার প্রস্তুতিপর্বের দিকে চেয়ে, 'বলেছিনু ভুলিব না যবে তব ছলছল আঁখি' সম্পর্কে করমচাঁদ থাপার কী ভাবে, ভাবি: লটারির টিকিটের জন্য লাইনটা, দেখি, বেলাশেষে ছোট হয়ে আসে।

কোনদিন মোহনবাগান মাঠের পিছনের অন্ধকারে বসে থাকি। একদিন ইডেন-গার্ডেনের কাছে গ্যাসপোস্টের নিচে হড়হড় করে একঝলক লাল উছলে পড়ল, কাছে এসে ঠোঁট লাল, চুড়ি লাল, কানের কুণ্ডল লাল, লাল শাড়ি-পরা একজন ঢ্যাঙা হিজড়ে এসে দাঁড়াল। আমি ভয় পাইনি, কিন্তু সে যখন কঠোর স্বরে বলল, 'কোনো ভয় নেই। তুমি বসে

থাকো,' তখন আমি আঁতকে উঠেছিলাম, যখন, দূরের রাস্তা উঠল চক্‌চকিয়ে, একজন মাতাল নাবিক চেঁচিয়ে উঠল, 'এই ফিটন,' ও ঘোড়ার খুরের শব্দ ধীরে ধীরে থামল। হিজড়েটা ফোর্টের দিকে একটা উঁচু টিলায় উঠতে আবার তার উদাসীন আধোজাগা গান শুনতে পেলাম।

জানিনা কখন আসবে, ঘুম আসছে না। গত মাস দুই ধরে আমার ঘুম হচ্ছে না। পরশু পুলকেশের হস্টেলে ছিলাম, দুটো সোনেরিল ট্যাবলেট খেয়েও ঘুম এল না দেখে আমার ভয় হয়েছে, তবে কি আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি? সত্যি, এত দুর্বল লাগে! কাশলে বুকে লাগে, ভাত খেতে গেলে কষ্ট হয়, মনে হয়, যে-পেশিগুলি গলধঃকরণের ব্যাপারে সাহায্য করছিল, সেগুলি আর পারছে না। মায়ার জন্যে কিছুই অনুভব করি না আর। প্রকৃতপক্ষে ওর মুখ ভুলে গেছি।

কিন্তু তখন শোনা গেল না যখন ভালবাসতে গেলাম, কেউ বলল না, 'সাবধান!' কেন ভালবাসতে গেলাম, অপ্রেম আমাকে অনেক দিয়েছিল, বহুদূর পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল, অমন চাঁদ দেখিয়েছিল যা থেকে কেবলি অন্ধকার ঝরে পড়ে, আর এক-পা বাড়ালে ছিল সেই আর্তনাদহীন আঁধার, মুহূর্তে আমি চ্যুত হতে পারতাম। হেমন্তের অবিরল পাতার মত টলতে টলতে নেমে যেতে পারতাম নিচে। কিন্তু যে-মুহূর্তে পা তুলতে গেলাম, হায়, উপত্যকা জুড়ে টালমাটাল, ধ্বনিতপ্রতিধ্বনিত বাল্মীকির গলা আমাকে ডেকে বলল 'মা নিষাদ!'

১৩

গ্যাসের আলো নিবে-যাবার পর ও সূর্য-ওঠার পর, আজ সকালবেলা দূর থেকে মায়াকে দেখলাম। দুটি বিনুনি করেছে চুলে, চুলের ভিতর দিয়ে চিক্ চিক্ করছে সোনার যুঁই, চুলে ওর ডান-গাল ঢাকা। বসন্তকালে, এ-রকম ভোরে, বাস-স্টপ ঝোলানো গ্যাসপোস্টের নিচে ও দাঁড়িয়েছিল। বনমহোৎসবের একটা ছোট গাছের কচিপাতা ঢেকে রেখেছে গ্যাসের বাল্বটা, ভোরবেলার প্রিয়তম রোদ্দুরে পাতাগুলো ঝাড়লণ্ঠনের মত দুলছিল। সহসা একটা আলোকিত পাতা উল্টে গাছটা তার অন্ধকার দিক দেখায়।

রাস্তা জনহীন। ফুটপাতের ওপর জাল ফেলে সারি সারি আরো গাছ নিস্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে। ফুটপাতে শূ-এর শব্দ তুলে দূর থেকে হেঁটে আসছে একজন লোক, তার গায়ে গলাকাটা শার্ট। যেন পদক্ষেপ গুনে গুনে সে এগিয়ে আসছে, ওর কাছে গিয়ে থামল, পাশে দাঁড়াল। ধুলো উড়িয়ে লোক-বোঝাই বাস চলে গেল না থেমে। সকালের লালধুলোওড়া সিন্দুরাভ আলো মায়ার পায়ের দিক থেকে উপরে উঠছে ঘূর্ণি দিয়ে, কুশণ্ডিকায় কুন্‌কে থেকে সিঁদুর ঢালার সময় যেমন হয়, ধুলোট সিঁদুরে ওর গা ভরে যাচ্ছে, দুই গালে লাগল, সমস্ত মুখ রক্তাভ সিঁদুরে ঢেকে গেল; চুলগুলি ওড়াউড়ি করছে তার ওপর। একটা বাস গেল, আর একটা বাস থামল। ঘসা কাঁচের ভিতর দিয়ে হ্যাণ্ডেল ধরার জন্য উত্তোলিত শাঁখার মত শাদা হাতটা পলকের জন্য দেখা গেল একবার, তারপর ভিড় এসে সেই নিমজ্জমান ব্যাকুলতা গ্রাস করল।

তারপর বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, তারপর রেস্তরাঁয় একটা

কারুকার্যকরা পাখার নিচে বসে, আমি ফুটপাতের ধারের কার্নিশে নির্জন পায়রার একটা ছবি দেখতে লাগলাম। ওরা সবাই উড়তে গেছে, ও যায়নি কিছুতে। ও ভোরের রাঙা পা-দুখানি বিস্মৃতিতে ডোবাল। কেউ জলে ঢেউ দিচ্ছে না, দেখতে দেখতে লাল হয়ে উঠল সারাপুকুর, পুকুর ওর আলতামাখা পা-দুখানি ধুয়ে দিচ্ছে। সারাদুপুর রাস্তা দিয়ে মেঘ গেল। সন্ধ্যা হলে, গা ধুতে এসে জলে ঢেউ দিল কে? রক্তের পুকুরে সর পড়ছে শাদা, একটা শাদা শালুক সুখে ভাসছে, ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আমি দেখে এলাম।

এখন অনেক রাতে বিছানা পেয়েছ
শান্তিনিস্তব্ধতা
এখন ভেবো না কোনো কথা
এখন শুনো না কোনো স্বর
রক্তাক্ত হৃদয় মুছে
ঘুমের ভিতর
রজনীগন্ধার মত মুদে থাকো।

১৫

রেণুর কাছে গিয়েছিলাম।

আর একজন লোক আসতে ও বের করে দিল। পূর্ণেন্দুর

ওখানে গিয়েছিলাম। রসা রোড থেকে হেঁটে এলাম। সমস্ত পথে গভীর রাতের কয়েকটি লোক উল্টোদিকে হেঁটে গেল। পার্ক স্ট্রীট ছাড়াতে অট্টহাস্য করে উঠেছিল কয়েকজন। তারপর থেকে চোখে-জজিয়ে-যাওয়া রাস্তা। বাড়ি। পাঁচিল-টপকানো।

আজ অমাবস্যা। কালোর মধ্যে মিশে যাচ্ছে বলে, একটা কাক অস্ফুট স্বরে ডেকে উঠল, কঃ! কলে জল পড়ছে টপ টপ। বা, রাত্রির বুকে বুজকুড়ি উঠছে। বা, দুপুরে ঘুঘুর ডাকের মত শব্দ হচ্ছে। রাত দুটো আর দুপুর দুটো কি একরকম? কোথায় ঘণ্টা বাজছে, মন্দিরে, এত রাতেও! দুপুরবেলা গলি দিয়ে কাঁসি বাজিয়ে বাসনঅলা যায়, এইরকম আওয়াজ হয়। না, মন্দিরে না, দেখেই তো এলাম, মোড়ে রক্ষেকালী পুজো হচ্ছে। রক্ষেকালীটা কী কালো। জিভ লাল টকটকে। তৃষ্ণায় 'কা' করে ডেকে উঠলে, কাকের জিভ যত লাল, তত। মা আলতা পরত, সিঁদুরে মুখ ঢেকে শ্মশানে গিয়েছিল।

ভালবাসা বলে কি কিছু নেই, প্রেম বলে! ঘৃণা, নরহত্যা, পাপবোধ, এগুলি কি মানুষের সঙ্গে অসম্পর্কিত? কারুকে কেন ভালবাসি না, নিজেকেও না, কেন কারুকে হত্যা করার ইচ্ছে আমার নেই!

ও। একটা শেয়াল জল খাচ্ছে। জ্যোৎস্নায় চমকানো ছোরার মত চক চক শব্দ উঠছে। আর এই অন্ধকার, এই আভা আর অন্ধকার, ঘাতকের বিবেক তৃপ্ত হয়, তার তৃষ্ণা মেটায় যা।

কী কষ্ট দিয়েছি নিজেকে, আজ সারাটা দিন। রেস্তরাঁয় দু-চার টুক্‌রো রুটি ছাড়া কিছু খাইনি, জল খাইনি এককোঁটা, ইচ্ছার শরীর ছিঁড়ে দিয়েছি রেণুকে। বাড়ি ফিরে ভেবেছিলাম বিছানায় লুটিয়ে পড়ব, অথচ কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে

পেরেছি বিছানার পাশে। নিজের ওপর এই সব অত্যাচার করা আমার দরকার। তবু তা পারছি কৈ, আঃ, পারছি না। এ তো শরীরের ছালই শুধু ছাড়াচ্ছি। অনেক ভিতরে আর্শির মত চক্‌চকে রক্তে জিভে দিতে পেরেছি কি, পারা আমার অত্যন্ত দরকার। এইরকম আমি আরো দিনকতক চালাব। এও জানি, বিনা কষ্টে আমি আজও সারারাত জেগে থাকব।

কিন্তু কখনো করি কখনো তোমাকে বিশ্বাস করি না হে ঈশ্বর, মায়াকে আমার চাই। দুঃখ ও শোক আলাদা, আমি জানি। দুঃখ আমি অনেক পেয়েছি, দেখেছি শোকগ্রস্ত শরীর! কিন্তু এ হচ্ছে ইচ্ছা। উৎকণ্ঠিত হয়ে আমি হাতড়ে বেড়াচ্ছি, কী নেই আমার শরীরে, কোনটা চলে গেছে, হৃদপিণ্ড? কোন জায়গাটা খালি, চোখ? অন্ধ হয় আমি খুঁজছি সেই জায়গাটা, যেখানে হৃদয় ছিল। তবে কি আমি আর শুনতে পাচ্ছি না, যা যা আমার জন্যে উচ্চারিত হচ্ছে!

অনেক দিন ধরে, অনেক নিচু থেকে ধীরে ধীরে যা জেগে উঠেছে, তা হল এই ইচ্ছা। আমার অস্তিত্বকে উপড়ে তুলে, এ এখন আমাকেই তা অর্পণ করতে পারে। আমার চোয়ালে-চোয়াল বসে যাচ্ছে, ঈশ্বর, ও কে আ মা র চাই!

আবার! আমার জমাট রক্ত এইমাত্র চম্‌কে উঠল, ঢালু পাড় দিয়ে নেমে এসে একটা শেয়াল আবার তার ছোরার মত রক্তিম জিভ দিয়ে জলস্পর্শ করছে। ভালবাসা, চরমতম ভালবাসায় আমার চোয়ালে চোয়াল বসে যাচ্ছে, চ্যাপ্টা হয়ে যাচ্ছে মাথা, ছুঁচলো হয়ে যাচ্ছে মুখ, সাপের ফণার মত বাঁকানো নিহত-তীব্রতার এই শরীর কোন অনিবার্য চুম্বনে তৃপ্ত হবে!

কার রক্ত স্পর্শ করে চক চক করে চাটবে ভালবাসার এই কাটা জিভ ?

আমি আলো জ্বেলেছি। টেবিলের ওপর উপুড় করে আমি শিউরাণিতে নরম, শিরার মত আঙুলের হাড়গুলি দেখছি।

১৬

অন্ধকারে ঝুলন্ত একটা সিঁড়ি, মাঝে মাঝে ধাপহীন, পা-ফেলে পা-ফেলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলে, সম্মুখে একটা দরজা পথরোধ করে দাঁড়াল। পাল্লার ফাঁক দিয়ে আসা ধুলো-ওড়া একফালি আলো, হাত দিয়ে ঠেলে দিতে পর্দার মত দুলে উঠল তা, ঘাতকের দীর্ঘ আঙুলগুলির আগে আগে শ্বাসরুদ্ধ ব্যক্তির রক্তকণিকা যেমন ছুটে যায়, লুকিয়ে পড়ে, হাতের ঝাপটায় উড়ন্ত ধুলো ব্যাকুলতার সেই নীল চিত্র রচনা করতে লাগল।···ঢালু পাড় দিয়ে নেমে এসে একটা শেয়াল চোখ ঘুরিয়ে একবার বাঁদিক, একবার ডান দিক দেখল। তাতে অন্ধকার থেকে দুবার কাচ চিরে যাবার শব্দ হল।···দরজাটা ভেজানো ছিল, ঠেলা দিতে খুলে গেল। শূন্য ডেকচেয়ারের পাশে টানাটানা তারকাহীন চোখ মেলে একটা সুদীর্ঘ মোমবাতি জ্বলছিল, টস টস করে গরম মোম পড়ছিল তার কোল দিয়ে। দরজা খুলে যেতেই, তীরের দিকে ধাবমান হাঁসের মত শিখাটা লম্বা হয়ে তার চঞ্চুদুটি উঁচু করে তুলে ধরল। যেন শূন্য ডেকচেয়ারে শায়িত কেউ এখুনি উঠে বসল সভয়ে, বাঁকানো ব্যাঁকারির মত দু-হাতে দুই হাতল আঁকড়ে ধরে, ঝুঁকে, বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে

দরজার দিকে, তার উৎকণ্ঠিত গলাটা ঝুলে রয়েছে।··· এক হাতে ধরা যায় না, দু-হাতে মোমবাতিটা উপড়ে ফেলার চেষ্টা করলে, তখন, তা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উলের বলের মত শিখাটা লাফিয়ে উঠল একবার, গা থেকে হাতের উপর টস টস করে পড়ছে গরম মোম, দশটা আঙুল মোমবাতির গলায় চেপে বসে যাচ্ছে ক্রমশ। খড়খড়ি-নামানো প্রায়ন্ধকার ঘরে এখন চচ্চড় শব্দ করে আলো জ্বলছে। গলাকাটা জানোয়ারের ধড় পুরানো মন্দিরের চাতালে যেমন লাফায়, শিখাটা দপদপ করে তেমনি লাফিয়ে উঠেছে মাঝে মাঝে। কখনো বা কম্পিত তৃণের মত ম্রিয়মান! শেষাবধি নিস্তেজ হয়ে এল, চোয়ালে চোয়াল-বসা আঙুলগুলো আরো গভীর দাগ ফেলে, আরো বেশি মাংস আকর্ষণ করে বসে যাচ্ছে, শাঁ শাঁ শব্দ তুলে দীর্ঘ সময় বহে যেতে দিয়ে মোমবাতিটা শ্বাস টানল কয়েকবার, দেওয়ালে একখণ্ড আয়নায় চকচকিয়ে উঠল অন্ধকার জল, টসটস করে হাতের ওপর দু-ফোঁটা গলা মোম পড়ল; এইসব মিলিত দৃশ্যের সম্মিলিত ও অলীক প্রয়াণের ভিতর থেকে, পোড়া লোমের নারকীয় গন্ধের মধ্যে, মরুভূমির কুকুরের লাল জিহ্বার মত শিখাটা অন্তিম তৃষ্ণায় উল্টে অবশেষে নেতিয়ে পড়ল। কেউ কেউ কালীপুজোর সময় অ্যালুমুনিয়মের তারবাজি পোড়ায়, এখন তেমনি পুড়ে যাচ্ছে। পুড়ে যাওয়া অংশটা গুটিয়ে পাকিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ কুঁকড়ে যাচ্ছে—ও কি এক বোবাকালা, যে যন্ত্রণায় ভূমিকায় অপরূপ অভিনয় করছে?··· সহসা ঝন ঝন শব্দের প্রতিধ্বনি তুলে কক্ষান্তরের বিশাল এক দরজা খুলে গেল, সেই আশ্চর্য আলো বিকীর্ণ-করা তারবাজির আলোয় দু-হাতে দুই পাল্লা চেপে ধরে চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে

মায়া চিৎকার করে উঠল, 'বাবা গো!' একবার চিৎকার করে উঠেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বাধাদানের ভঙ্গিতে বাহু-মেলে-ধরা অজ্ঞাত প্রতিমার মত, ঝন ঝন শব্দের প্রতিধ্বনির ভিতর কক্ষ ও কক্ষান্তর থেকে আরো দূর কক্ষ ও কক্ষান্তরে মিলিয়ে যাচ্ছে চিৎকার, ডাকসাজের কোঁকড়ানো কৃষ্ণ পরচুলায় ওর ডান গাল ও কানদুটি ঢাকা, মণিবন্ধ অবধি প্রবাহিত, দরজা চেপে-ধরা ধবল আঙুলগুলি ও মৃগকর্ণের মত রাঙুল তালুর আভাসটুকু দেখা যায়। সিন্দুরাভ রক্ত সিঁথি থেকে গড়িয়ে পড়ে ওর ললাটের রেখাগুলি মুছে দিচ্ছে, নিষ্পিষ্ট ঠোঁটদুটি চিতা থেকে নিক্ষিপ্ত কাঠের মত জ্বলে লাল ছাই হয়ে আছে, ভিজে সপ সপ করছে ভ্রূ, রক্তে রক্তে সমস্ত মুখমণ্ডল ঢেকে গেল। শুধু নিবদ্ধ চক্ষুদুটি অন্ধকারে স্থির হীরকের মত জ্বলে।

কাছে গিয়ে মোমবাতিটাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করলাম। দেখলাম, দু-হাতে জড়ানো যায় না। আমার হাত-দুটো আহ্বানের ভঙ্গিতে লেপ্টে রইল, লেপ্টে রইল আমার সমস্ত শরীর, অতিকায় সেই মোমবাতির পিচ্ছিল গোড়াটা দু-হাতে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করতে করতে, মোমবাতির গোড়াটা দু-হাতে জড়িয়ে ধরে আমি উপুড় হয়ে শুয়ে রইলাম।

১৭

পরশুদিন রাতে একটা স্বপ্ন দেখে আজ সকালে কলকাতায় এসে পৌঁছেচি। বিকেলে মায়াকে দূর থেকেই দেখা গেল, অফিস-ভাঙা ভিড় এড়িয়ে স্ট্যাণ্ডের কাছে একটা কালো

টু-বি বাসে বসে রয়েছে জানালার ধারে, মাথা নিচু করে, বোধহয় কোনো মাসিকপত্র পড়ছিল। এর আগে এ-রকম বাসে একা বসে থাকতে আমি কারুকে দেখিনি। শ্যামবাজার মোড় এখন মলিন কিরণে ভর্তি, পড়ন্ত আলোয় গৃহঅভিমুখে মানুষ, গৃহ থেকে নির্গত হয়ে মানুষ, সকলেই হেঁটমুখে ও বিনয়সহকারে হাঁটাহাঁটি করছে। অদূরে একটা সাবানের বিজ্ঞাপন অসময়ে জ্বলে উঠল, পুরানো বই-এর দোকানে এসে পড়ল তার আলো, ইলেকট্রিক তারে ঝুলের মত ধোঁয়া ও লটকানো ঘুড়ি, চুড়ির দোকানে বিচ্ছুরিত শোভার মধ্যে নিঃসঙ্গ মুসলমান, বিকেলের জানালায় দাগকাটা কিশোরী, ও ওষুধের দোকানে অসম্ভব ভিড়। মুক্তির অপেক্ষায় একটি ছবির ব্যানারের নিচে রেস্তরাঁর সামনে কয়েকজন যুবক রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে, তাদের সামনে অপেক্ষমান ডবল-ডেকার ও দম্পতির নিকট প্রার্থনারত ভিখারী, ট্রাফিক-আইল্যাণ্ডে ঘুর্ণায়মান পুলিশ বা দূরে ব্রিজের ওপর মন্থর ট্রাম—এইসব দৃশ্য। উপরে জীর্ণ বারান্দায় টাঙানো ঢাকাই শাড়ি, চেকলুঙ্গি ও উজ্জ্বল ব্লাউজগুলি মনোরম বাতাসে শুকোয়, সূর্যাস্তের দীর্ঘরশ্মি স্পর্শ করলে সেগুলি খর্খর করে ওঠে। এইসব হঠাৎ একসঙ্গে দেখলে মনে হয় এ-পৃথিবীতে দ্রুত ও নিশ্চিতভাবে কিছুই ঘটে না।···নিচে মাটি শুঁকতে শুঁকতে একটা পুলিশভ্যান মাঝে মাঝে যাতায়াত করে।

এখন শরৎকাল। কিন্তু শ্যামবাজারে তার কোনো রূপ, কোন চিহ্ন নেই। বাসের কাছে গিয়ে দাঁড়াবার পর ও অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকার পর মায়া চোখ তুলে চাইল, 'আরে, আপনি!'

হাঁসপাতাল, বেশ্যাপল্লী ও ভাড়াবাড়িতে, গলির পানের দোকানে ও রাস্তার মোড়ে, চতুর্দিকে এবং এই রেস্তরাঁয় একটা প্রীতিকর সমবেত-গানের রেকর্ড বাজছিল। কেবিনে ঝুলন্ত ঢাকা আলোর নিচে, ব্যস্ত না হয়ে, আমরা অলসভাবে কথাবার্তা সুরু করলাম।

'বাবা, আমার জামাকাপড়ও সব জানেন দেখছি!' মায়া বলল। 'আগে দেখিনি তো, তাই বলছিলাম।' আমি বললাম। 'গেরুয়া রঙের, অথচ মজা দেখুন, সপ্তমীর দিন আমার জন্ম, জন্মদিনে বড়দি এটা কিনে দিয়েছিল বাগবাজার একজিবিশন থেকে! না, সত্যিই এ-শাড়িটা আমি আগে পরিনি।'

'অন্তত আমি দেখিনি।' সাফল্যে হেসে ফেলে বাকিটুকু বললাম শুধু ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে, 'এর আগে খালি বাসে একা বসে থাকতে আমি কারুকে দেখিনি।'

'চার-পাঁচ মাস দেখা নেই, কোথায় ছিলেন, কই বললেন না তো?'

'— — — — — —'

'ও!'

'— — — — — — — — — —'

'সত্যি?' মায়া কুলকুল করে হাসতে লাগল, 'তারপর, ওখানে ওরা কী বলল?'

'— — — — — —'

'এ হে।'

'— — — — — —'

'তাই তো! আমার অফিসটা কোথায় আপনাকে বলিনি, না?'

'ইশ্, কী এ্যামবিশাস্।'

'— — — — —'

'তাই নাকি, বেশ বুদ্ধিমান তো আপনি! আচ্ছা, লোকটা কি সত্যই ভাল?'

'আপনার ভাই নেই? তবে যে বলেছিলেন—কী মিথ্যেবাদী আপনি!' স্ফুরিত ঠোঁটে মায়া বলল। আন্তরিকভাবে চেয়ে থেকে বলল, 'আপনার মা-র সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন না?' 'বেঁচে নেই!' কথাটা এমন দুঃখিতভাবে বলল যে, শুধু অস্ফুটস্বরের 'নেই!' শোনা গেল।

আমার দ্বিতীয়বারের কাপের কিনারায় এনামেল-করা চিনিভর্তি চামচেটা কাঁপতে লাগল, যেন একটা শিহরণ ধরে আছে দু-আঙুলে, যখন ও আগ্রহভরে আমাকে অভিযুক্ত করল, 'মা নেই, ভাই নেই, বাবাকে দেখেননি, কে আছে তবে আপনার?'

এই সময় সত্যিই একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। আমরা খুব ধীর ও অলসভাবে দেড়ঘণ্টা সময় বহে যেতে দিয়েছিলাম দ্রুত, ওয়েটার বিল নিয়ে বেরিয়ে গেলে কেবিনে বসেই আমি টের পেলাম রেস্তরাঁ এখন অনেক পাতলা হয়ে গিয়েছে, যারা আমাদের প্রবেশ করতে দেখেছিল তারা আর কেউ নেই, কিছু অন্য লোকজন আমাদের বেরিয়ে যেতে দেখবে।

এই সময় বাইরে ওই ফুটপাথে কী নিয়ে কাদের কোলাহল হল, পরমুহূর্তে একটা ডবলডেকার রেঁস্তরার সামনের স্টপে দাঁড়িয়ে মুছে দিল রাস্তাটা. এইসময় সহসা রেকর্ডে এক জায়গায় পিন আটকে গেল।

'এই দীনতা ক্ষমা করো প্রভু' অকুল হয়ে উঠে কীর্তিনাশা গলা ভাড়াবাড়িতে ও হাসপাতালে ভাঙতে লাগল শতখান হয়ে, 'ক্ষমা করো প্রভু,' 'ক্ষমা করো প্রভু,' পিন-আটকানো রেকর্ড ভুল সুরে ঘুরে ঘুরে কেবলি বাজতে লাগল বেশ্যাপল্লীতে, 'দীনতা ক্ষমা করো' 'দীনতা ক্ষমা করো,' ক্রমে পিন পুঁতে গেলে চাবুকের ঘন ঘন শব্দের মত রেস্তরাঁর ভিতর অকথ্য বেসুরে শিষ্ দিতে থাকলে সেতার, 'প্রভু,' 'প্রভু,' 'প্রভু'…

অবর্ণনীয় নরকণ্ঠ থেকে কী আতঙ্ককর সেই রক্তপাত !

আমি হাঁটুমোড়া পা-দুটো চেয়ারের তলা থেকে টেনে বের করতে করতে, ঝুলন্ত, ঢাকা আলোর নিচে টেবিলের ওপর হাড়-ওঠা দশটা আঙুল উপুড় করে রাখলাম। গুলিয়ে-যাওয়া, প্রায় অর্থহীনভাবে হেসে উঠে মায়া বলল, 'আচ্ছা, কেন ছুটি নিলাম একমাস, কই কিছু জিজ্ঞাসা—'

আমার সর্বশরীর কাঁপছিল, অবশ্য ও প্রথমে আঙুলগুলিই দেখে থাকবে। আমার চোখের সামনে কাঁপতে কাঁপতে আমার কীর্তিহীন শরীর নতজানু হয়ে ওর কোলের উপর শৃঙ্খলিত হাতদুটি রাখল, রেখে বলল, 'এই দশটা আঙুল ছাখো। ছাখো, আমার দু-হাতের আঙুল একরকম নয়। ভীষণ রুগ্ন ও লোমহীন এই শাদা আঙুলগুলো ছাখো।'

'কী হল আপনার ?' মায়া তখনো বলছিল।

টেবিলের উপর হাতদুটি ফেলে রেখে, ধোঁয়ার মধ্য থেকে ওর সামনে পরিস্ফুট হতে হতে বললাম, 'ঘাতকের এইরকম হয়।' কিন্তু বলার জন্য এবারেও আমাকে ওষ্ঠব্যবহার করতে হল না। ওর ভ্রূ-তে ভ্রূ আটকে আমি ওর দিকে চাইলাম।

ঠোঁট ফাঁক করে আমি অনেকক্ষণ ওর দিকে চেয়ে রইলাম,

স্মৃতি এসে ওষ্ঠ ও অধরে আশ্রয় নিলে ক্রমে রঞ্জিত হয়ে উঠতে লাগল ওর ঠোঁটদুটি, আমার হাঁ-করা মুখ থেকে নির্গত হয়ে এক বোবাকালা ওর অভ্যন্তরস্থ বোবাকে স্পর্শ করল, সহস্রচক্ষু প্রস্থানভূমির অন্ধকার থেকে তুলে এনে, সে, পাছে লীন হয়ে যায়, এতদিনের সকল কথাবার্তা, তার প্রতিটি অক্ষর ও তাদের গোপন পরিচয় দেখাতে লাগল। এতদিনের কথাবার্তা নেপথ্য থেকে উঠে এসে কোলাহল করে ঘিরে ধরেছে ওকে, হাত ধরে, জামাকাপড় ধরে টানটানি করছে বারে বারে, যেন বা মেঘের মত একঝাঁক ভ্রমর অগ্রসর হচ্ছে তার দিকে···

কাপড় গয়না বাজিয়ে আচম্বিতে উঠে দাঁড়াল মায়া। সম্পূর্ণ পাগলাটে গলায় সংক্ষেপে বলল, 'চলি।' ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, এতদিন দেখা হল, এখন আর জিজ্ঞাসা করা চলেই না, আপনার নামটা কিন্তু আমি কোনদিন জানি না।'

আমি হাত তুললাম: দাঁড়াও।

মায়া: যাক, একটা সমস্যা গেল।

আমি: দাঁড়াও!

মায়া: আমার নাম তো জানেন। যাই তাহলে?

এইসময় কালো ইস্পাতে ঢাকা একটা পুলিশ-ভ্যান রেস্তরাঁর সামনে পৌঁছে দারুণ জোরে ব্রেক কষল। ককিয়ে উঠে রাস্তার ওপর ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগল গাড়িটা, সমস্ত কেবিন কেঁপে উঠল তারপর। একেবারে তৎক্ষণাৎ ঝন্ ঝন্ করে রেস্তরাঁর কাচের দরজার বিশাল পাল্লাদুটি খুলে গেল, শূ-এর শব্দ তুলে হেঁটে এসে একজন আগন্তুক অতিরিক্ত আলো ফেলে রেস্তরাঁর ভিতর ঢুকল। হলের মাঝখানে পৌঁছে পা ফাঁক করে দাঁড়াল।

গান থেমে গেল।

'তোমার ডাকনাম কী?' সেই কাঁপুনি ও ঝনাৎকারের মধ্যে আমি এই প্রথম আমার এক অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, যে স্বরে এর আগে আমি কখনো কথা বলিনি।

কিছুকাল পরে মায়া ঘুরে দাঁড়াল টেবিলের কোণাটুকু ধরে, কেবিনের ঢাকা আলোর নিচে টেবিলের উপর পড়ে-থাকা অস্ত্রহীন, নিপাতিত ও নগ্ন হাতদুটি নেড়ে দেখল, পরে বাঁ-দিক উল্টে অন্ধকার থেকে ডান-গাল ফেরাল, অলস মুঠিতে কানের পিছনে কেশরাশ ধরে রেখে, ক্ষণকাল তার ডান-গালের গভীর ক্ষতচিহ্ন দেখাল।

উড়ন্ত পর্দার ধার থেকে শান্ত ও নিস্তব্ধভাবে সে আমার চোখের দিকে তাকায়। কতদূর থেকে সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, যেন তার স্মিতচক্ষুদু'টি পৃথিবীতে কিছুই দ্রুত ও নিশ্চিতভাবে ঘটে না এই জেনে তা সমর্থন করছে।

দর্পণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজের হাসি স্বচক্ষে দেখে মাতাল যেমন করে হাসে, আমি সেইরকম হাসলাম।

সে বলল: এ আমি জানতাম।

আমি: তুমি বিধবা হয়েছ আমাকে বলনি কেন?

সে: জানি যে তুমিই আমাকে বিধবা করেছ।